ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি

ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি।



সাধক-কণ্ঠহার সিরিজ—১

ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি

(স্মৃতিসুধা)

"আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত



ভাগবত-তত্ত্ব-পরিষদ্

"বাণীকুঞ্জ," বরাহনগর, কলিকাতা

১৩৩০

[মূল্য ৸৹ বার আনা।

প্রকাশক—
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ।
"বাণীকুঞ্জ," বরাহনগর,
ভায়া কলিকাতা।

"যা মনে করি তা সকলি তোমার
কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়
আত্মসমর্পণ করি, লওহে নাথ দয়া করি
তোমার ধন তুমি লও কাজ নাই আমার তায়।"

প্রিণ্টার—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২১।এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

উপহার

উৎসর্গ

জগৎগুরু যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ত্যাগী
লীলা-সহচরদিগের অন্যতম পরম ভক্তিভাজন
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজীর
করকমলে এ দীন কিঙ্করের
বড় আদরের "ব্রহ্মানন্দ-
প্রশস্তি" খানি শ্রদ্ধা
ও প্রীতির নিদর্শন
স্বরূপ উৎসর্গীকৃত
হইল।

কিঙ্করের নিবেদন

এখন হইতে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত মাসিক "প্রতিবাসী"র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় আমাদিকের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্য বন্ধু রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের বিরচিত একটি ধর্ম্ম-সঙ্গীত বাহির হয়। তাঁহার ঐ গানটির স্মৃতি আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে তখন হইতে এখনও নিয়তই প্রতিধ্বনিত হয়—

"দিন কি ফুরাল হরি, ভাবি মাঝে মাঝে তাই।
জন্ম গেছে বৃথা কাজে, আর কি উপায় নাই॥
আছে কৃপা, আছে নাম, রামকৃষ্ণ প্রাণারাম,
গুরু রূপে পরিত্রাণ, করেন জগৎ-গোঁসাই॥
পতিতেরে দেন কোল, নিজে দিয়ে হরিবোল,
মা-নামে ভাবে বিভোল, জীব দুঃখে কাঁদেন সদাই॥
থাকতে এমন দয়াল ঠাকুর, ভয় কিরে তোর এ ভবপুর,
নেরে শরণ সেই অভয় চরণ,
ধোরে নামের ভেলা ভেসে যাই॥"

ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস ভক্তেতেই পর্য্যবসিত হয়। এ অধম পামর তাহার কি রসাস্বাদ বুঝিবে? নবযুগের যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও সাধনা এই বিংশ শতাব্দীর কত যে কল্যাণপ্রদ সামগ্রী তাহার বিস্তৃত আলোচনা এক্ষণে অনাবশ্যক। যুগাবতারের লীলা-সহচরগণ হচ্চেন একমাত্র আমাদিগের শান্তি ও সান্ত্বনার স্থল। এ স্থানে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে

না। দেশের নবজাগরণের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা পার্ষদ্‌গণের পবিত্র সঙ্গসুখ কত যে মধুর, তাহা যাঁহারা একদিনের জন্যও পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি প্রমুখদিকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন—তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। এ অধমাধম লেখকের ভাগ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী সেবকগণের প্রায় সকলেরই দর্শন এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে যাওয়া বহুবার ঘটিয়াছে। এই সূত্রে এ দীন সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস পুত্র আবাল বৃদ্ধবনিতার পরম ভক্তিভাজন বরেণ্য নরদেব শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজেরও সঙ্গ বহুদিন করিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণায় এ অধম কিঙ্কর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা এই "ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি" নামধেয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, বলা বাহুল্য তাহাতে লেখকের পক্ষ হইতে কোন কিছু কথা বলা হয় নাই। বলিবার সে শক্তি লেখকেরও নাই। রামকৃষ্ণ সাহিত্য এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন গণের নিকট হইতে দীন সেবক যাহা যাহা ইতিপূর্ব্বে সংগ্রহ করে কেবল তাহাই যেন তেন প্রকারে, নিজের ক্ষীণকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে জানিবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ত্যাগী সেবক পরম পূজ্যপাদ মদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীর আদেশে ভক্তিভাজন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজজীর সভাপতিত্বে বঙ্গসাহিত্যের সুলেখক আমাদিগের পূজনীয় ভাগবত সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার এম. এ, বি, এল মুন্‌সেফ্ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সরসী লাল সরকার বি, এস, সি মহাশয় এ দীন সেবকের শরীর বিশেষ খারাপ থাকাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের বর্ত্তমান পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্টের আদেশক্রমে "ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি"র পাণ্ডু লিপিখানি শ্রীশ্রীমহারাজজীর

৬১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত সনের ৫ই মাঘ বেলুড়ের শ্রীশ্রীমঠে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করেন। মদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজদ্বয়ও তাঁহাদের এ সেবকের এই অকিঞ্চিৎ-কর রচনাটির সুখ্যাতিও করেন। সর্ব্বসাধারণও প্রবন্ধ পাঠ কালীন তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজজীর স্মৃতিসুধার স্বরগুলি শ্রবণ করেন। সর্ব্বসাধারণের সমীপে পঠিত প্রবন্ধ এত শীঘ্র যে পুস্তকাকারে বাহির হইবে তাহাও আশা করা যায় নাই।

এ দীন কিঙ্করের বিশেষ দুরবস্থা অবগত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শূরভক্ত মহাত্মা কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ দাদাদ্বয় চার রিম কাগজ এক কালীন দান করেন। মেসার্স জন ডিকেন্ সন্ এণ্ড কোম্পানীর বর্ত্তমান বড় বাবু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ইহার কভার ও ছবি ছাপিবার জন্য দেড় রিমের উপর কাগজ দান করিয়াছেন। ইঁহাদেরই প্রথম দান অবলম্বন করিয়া "ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি"কে প্রেসে দেওয়া হয়। আমাদের অন্তরঙ্গ সাহিত্য-বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ সেন মহাশয় এই গ্রন্থের কভারটি তাঁহার 'করুণা প্রেস' নামক ছাপাখানা হইতে ছাপাইয়া দিয়াছেন। কিঙ্করের সোদর প্রতিম সাহিত্য-বন্ধু, কবিবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই "ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি"র পাণ্ডুলিপি খানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজজী সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা দিয়াছেন। তাহা এইগ্রন্থের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার লিখিত ঐ কবিতাটির একটি ইংরাজী অনুবাদও আমরা বিখ্যাত দেবালয় এসোসিয়সনের মুখপত্র "The Devalaya Review" হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের পরি-শিষ্টের দুই ফর্ম্মার রচনার জন্য তাহার লেখকবর্গের নিকট আমরা ঋণী

রহিলাম। "নায়ক"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইঙ্গিতানুসারে ঐ পরিশিষ্ট প্রদত্ত হয়। তিনি ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আমাদের দুরদৃষ্ট, তিনিও এক্ষণে ইহলোক হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণালোকে মহারাজজীর সঙ্গী হইয়াছেন। মহারাজ-জীর প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের বিষয় আলোচনা করিবার সাধ এ দীন সেবকের হৃদয়ে অনেক দিন হইতে উঠে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীদেব সম্বন্ধে মজিলপুরে দুই দিন এক প্রবন্ধ পাঠও হয়। এখন তাঁহার প্রধান লীলা-পার্ষদের জীবনের যৎকিঞ্চিৎমাত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। কিরূপ দাঁড়াইল সে বিচার পাঠকবর্গের উপরই রহিল।

উপসংহারে নিম্নলিখিত অর্থসাহায্য এবং তাহার দাতাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এই ব্যয়সাধ্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহারও ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করা হইল। শ্রীশ্রীমহারাজজীর উদারহৃদয় প্রিয়শিষ্য ও সেবক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দে মহাশয় ১৩০৲, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল ১০৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, বি এল ৮৲, পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী আমোদিনী দেবী এবং তাঁহার বিদুষী কন্যা শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবী ৫৲, পরম পূজনীয়া শ্রীমতী নন্দিনী দেবী ৪৲, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ৪৲, A well-wisher of Nobin Sircar Lane, Baghbazar ৪৲, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাল ২৲, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দে ১৲, শ্রীযুক্ত দুনীলাল শীল ১৲, স্বামী সিদ্ধানন্দ ১৲, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র (পার্শীবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি) ১৲, পরম পূজনীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণা রুদ্র ১৲, পরম পূজনীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী মিত্র ১৲, দীন কিঙ্করের ভক্তিমতী বিদুষী পত্নী সম্প্রতি পরলোকগতা অন্নপূর্ণা

মিত্র তাঁহার কয়েকটি শিল্পকার্য্য বিক্রয় করিয়া ১০৲ টাকা দেন। মাত্র দশ ঘণ্টার ভীষণ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তিনি এই সনের ২২শে আষাঢ় শনিবার ইংরাজী ৭ই জুলাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণালোকে মহাযাত্রা করিয়াছেন। এখন ইহলোকে আর এ কিঙ্করের আপনার বলিতে কেহ নাই। ইহজীবনের বাকী অবশিষ্ট কালটা অর্থভিক্ষা শিক্ষা করতঃ ভাগবত-তত্ত্ব-সুধানিধি প্রচার করিতে অভিলাষী হইয়াছি। শ্রীশ্রীদেব বোধ হয় এ দরিদ্র কিঙ্করের শেষ সাধটি পূর্ণ করিবেন। ইতি—

"বাণীকুঞ্জ"
বরাহনগর, ভায়া কলিকাতা।
২৫ শে শ্রাবণ, সন ১৩৩০ সাল।

সেবক—
শ্রীসত্য চরণ মিত্র।



স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি

১

"রামকৃষ্ণস্তভূৎ যেন পুত্রবান্ ভৌমমণ্ডলে।
'ব্রহ্মানন্দং' নমামি ত্বাং রাখালদলনায়কম্॥"

২৫শে পৌষ ১৩২৯, ইংরাজী ৯ই জানুয়ারী ১৯২৩, মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়-শিষ্য ও সেবক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের একোষষ্ঠীতম জন্মোৎসব এই শ্রীমঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগের অনেকেই ঐ উৎসব-অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাহারই ঠিক এগার দিন পর, আজ আবার আপনারা যাঁহার শুভ-জন্মতিথি পূজা বা জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য এই শ্রীমঠে শুভাগমন করিয়াছেন দেখিতে দেখিতে ঠিক নয় মাস আটদিন হইল তিনি আমাদিগের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজের ৬১তম জন্ম-তিথি পূজা উপলক্ষে বেলুড়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে সাধারণের যোগ-দান। তথায় লেখকের "ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি"র পাণ্ডুলিপি পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে পাঠ হয়।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ স্বগণের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ইহলোকে মানবশরীরে যাট বৎসর দুইমাস দশদিন ছিলেন। বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সাল, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী সিক্‌রা কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে তিনি আবির্ভূত হন। কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে সিক্‌রার ঘোষবংশ বরাবর বিখ্যাত ছিল। ঐ বংশের সহিত শ্রীপাট পানিহাটীর মিত্রবংশের এবং কোন্নগরের মিত্রবংশের পর্য্যন্ত বিবাহে পুত্রকন্যাদির আদান প্রদানও প্রচলিত আছে।

সিক্‌রার ঘোষবংশে শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আবির্ভাব। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী।

বসু উপাধিধারী বঙ্গীয় কায়স্থবংশের পুত্রকন্যাগণের সহিত ঐ বিখ্যাত তিন ঘরের পুত্রকন্যার বিবাহ ইতিপূর্ব্বে বহুবার মহাসমারোহে সম্পন্নও হইয়া গিয়াছে। বড় বড় কুলীন কায়স্থগণের সিক্‌রায় বসবাস হওয়াতে ঐ অঞ্চলের প্রধানগণ সিক্‌রা গ্রামখানির কিয়দংশের নামকরণ করেন—কুলীনপাড়া। কালে ঐ কুলীনপাড়া, কুলীনগ্রামে গিয়া দাঁড়ায়। সেই অবধি সিক্‌রার কুলীনপাড়ার নাম হয়—কুলীনগ্রাম। ঐ কুলীনগ্রাম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজের আবির্ভাবে আজ একটি মহাতীর্থ।

সিক্‌রার কুলীনপাড়া কালে কুলীনগ্রামে পরিণত।

সংসারাশ্রমের নাম। পূর্ব্ব-পুরুষ—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম।

তাঁহার সংসারাশ্রমের নাম ছিল শ্রীরাখালচন্দ্র দাস ঘোষ। পিতার নাম ৺আনন্দমোহন দাস ঘোষ। পিতামহের নাম ৺হরিশ্চন্দ্র দাস ঘোষ। প্রপিতামহের নাম ৺মনোহর দাস ঘোষ। মনোহর বাবুর পাঁচ পুত্র। হরিশ্চন্দ্র তন্মধ্যে মধ্যম ছিলেন। এই হরিশ্চন্দ্রের মধ্যম পুত্র ছিলেন শ্রীশ্রীমহারাজজীর জনক।

তাঁহাদিগের খ্যাতি। মহারাজজীর মাতামহ ও মাতামহীর কথা।

মহারাজের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি সেকালের বঙ্গসমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদিগের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মহারাজজী আনন্দমোহন বাবুর প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। বসীরহাট সবডিবিসনের নিকটবর্ত্তী ট্যাটরাগ্রাম মহারাজজীর মাতামহাশ্রম। তাঁহার মাতামহ দেব-দ্বিজে পরম ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। মহারাজজীর মাতামহী নিত্য ব্রাহ্মণের পদরজ না লইয়া জল পর্য্যন্ত পান করিতেন না। তিনি একজন বিশেষ ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তাঁহার দিদিমার ও মার ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি ও অচল বিশ্বাস ছিল। সেই সব প্রসঙ্গ একসময় মহারাজজী আমাদের পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী নন্দিনী দেবীকে বলেন। প্রবন্ধ-লেখকের পরম পূজনীয়া পিতামহীর নিকটও তাঁহাদের কথা বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বাবু সিকরার একজন জমিদার ছিলেন। তাঁহার ন্যায়-প্রভাব ঐ অঞ্চলের অন্যান্য জমিদার এবং ধনী বর্গের শিক্ষার জিনিষ ছিল। লোকের প্রতি উৎপীড়ন তিনি কখনও করেন নাই। অবিচার ও অত্যাচার তাঁহার জমীদারীতে এক-দিনের জন্যও হয় নাই। সকল কার্য্য সুবিচারের সহিত সম্পন্ন করিতে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার বিদুষী পত্নী ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ এবং ধ্যান ধারণাতে তিনি বড়ই প্রীতা থাকিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি না কি তাঁহার স্বামীদেবকে মাঝে মাঝে বলিতেন, 'আমাদের ঘরে যে সন্তান আস্‌বে—তাহার দ্বারা আমাদের উভয়ের মুখ উজ্জ্বল হ'বে'।

পিতামাতার সদ্‌গুণ। পুত্রের বিষয়ে জননীদেবীর বাণী।

ধার্ম্মিক সৎপুত্রের দ্বারাই বংশ পবিত্র এবং মাতাপিতার মুখ উজ্জ্বল হয়। এক্ষণে ঐ ভক্তিমতী নারীর বাক্য কতদূর যে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে—আজ তিনি জীবিতা থাকিলে তাহা দেখিতে পাইতেন। ধন্য রত্নগর্ভা!

ধার্ম্মিক সৎ-পুত্র।

২

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর আনন্দমোহন বাবু পুনরায়

বিবাহ করেন। বালক ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সৎমার নিকট লালিত পালিত হইতে থাকেন। বিমাতাকে তিনি নিজের মার স্থানে বসাইয়া তাঁহার কাছে যখন যে আব্দার করিতেন, বিমাতাও নিজের পুত্রবোধে ব্রহ্মানন্দের সকল আব্দারগুলি একে একে পূর্ণ করিয়া সপত্নী-পুত্রকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও বাহিরের কাহাকেও জানিতে দেন নাই যে, ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সপত্নী-পুত্র।

মাতৃবিয়োগ। বিমাতার কাছে অবস্থান। বিমাতার স্নেহ।

যথারীতি পুত্রের হাতে খড়ি দিয়া, পিতা আনন্দমোহন ব্রহ্মানন্দকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করেন। তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষকের নাম ৺প্রসন্নচন্দ্র সরকার। প্রসন্নবাবু ছাত্রের অপূর্ব্ব মেধা শক্তিতে পরম প্রীত হন। শিক্ষকের নিকট পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দের পিতামাতা বিশেষ আনন্দিত হন। তিনি বাল্যকালে সুস্থ ও সবল ছিলেন। তাঁহার দৈহিক বলও বেশ ছিল।

বিদ্যারম্ভ। তাঁহার সেই সময়ের মেধাশক্তি। স্বাস্থ্য।

অতি শৈশবকাল হইতে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। বৈষ্ণব-ভিখারীগণের মুখে হরি গুণগান তিনি শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। কোন স্থানে বৈষ্ণবেরা গান গাহিতেছে জানিতে পারিলে তখনই তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। মার নিকট হইতে পয়সা লইয়া তিনি বৈষ্ণব-

ভিখারীকে দিতেন। শ্যাম-শ্যামার সঙ্গীত তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। এক সময় তিনি আমাদিগকে বলেন, "তোদের বরাহনগরের অমূল্য দত্ত বেশ গায়। অমূল্যর গান আমার বড় ভাল লাগে"। সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের মুখেও তিনি বহুবার ভাল ভাল ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করেন।

সঙ্গীতে অনুরাগ। শ্যাম-শ্যামার সঙ্গীত শ্রবণ। অমূল্য দত্ত ও পুলিনকৃষ্ণ মিত্র।

আমাদিগের সহপাঠী বাল্যবন্ধু নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁহাকে কয়েকটি ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনাইলে তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া যান। বন্ধুবরের অকাল বিয়োগ সমাচার শুনিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত হন। অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির মুখে তিনি ভাল ভাল ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করেন। তিনি বলিতেন, "সঙ্গীত যখন হয়, সেই বিষয়ের দেবতার তখন তথায় আবির্ভাবও হয়"। একথা অনেকের নিকট তিনি অনেক বার বলিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সঙ্গীত 'সৎসঙ্গী' ইহাও তিনি বলিতেন।

ধর্ম্ম-সঙ্গীতে তন্ময়তা।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন ঘোষ মহাশয় প্রতি বৎসর দুর্গামা'কে নিজগৃহে আনিতেন। বালক ব্রহ্মানন্দ পিতার পশ্চাতে বসিয়া দশভূজার প্রতিমা দেখিতেন। দেবীর আরতি দেখিতে দেখিতে ঢাকঢোলের গুরুগম্ভীররোলে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। বাজনা থামিলে তাঁহার মন খারাপ হইয়া যাইত। এক সময় তিনি তাঁহার বিমাতাকে বলেন, "দেখ মা! দুর্গামার আরতি

আমার দে'খ্‌তে বড় ভাল লাগে"। ইহা শুনিয়া তাঁহার বিমাতা পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তির বীজ তাঁহার অন্তরে বাল্যকালে কে যে রোপন করে, তাহা আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এখনও কিছু অবগত হইতে পারি নাই। কালে হইবে কিনা তাহাও বলিতে পারা যায় না। তাঁহার শ্যালক ভক্তবর স্বর্গীয় মনমোহন মিত্র মহাশয় বলিতেন, "রাখালের হৃদয়াভ্যন্তরে ধর্ম্মাঙ্কুর বরাবরই ছিল"।

বালক ব্রহ্মানন্দের দুর্গামার আরতি দর্শন। আরতি দর্শন করিতে করিতে তাঁহার তন্ময়তা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে ব্রহ্মানন্দ দ্বাদশ বর্ষে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ট্রেণিং একাডেমীতে ভর্ত্তি হন। এই ট্রেণিং একাডেমীই তাঁহার উচ্চ শিক্ষার শেষ স্থল। তাঁহার মাতৃদেবীর বিশেষ অনুরোধে পিতা আনন্দমোহন বাবু পুত্রের ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্র কুলোদ্ভব ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। স্বর্গীয় ভুবন বাবুর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ স্বভাবতঃ ঈশ্বরে ভক্তিমান ও ভক্তিমতী ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার পত্নীর বয়ঃক্রম

ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন। বিবাহ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন। অন্তরঙ্গ স্বগণ মধ্যে গণ্য।

দশ বৎসর। বিবাহের বৎসরাধিক পরেই তিনি তাঁহার পরম ভগবদ্ভক্ত শ্যালক মনমোহন মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী কোন্নগর হইতে শ্বাশুড়ী, শালাজ, শালী প্রভৃতির সঙ্গে এক নৌকাযোগে শ্রীদক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন-মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে যান। তারপর কয়েকবার তিনি মনমোহন বাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। পরে তিনি কাঙ্গালের পতিতপাবন শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ স্বগণ মধ্যে গণ্য হন।

৩

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"র অমর কথক, আমাদের শ্রীম বা পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয়ের মতে '১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীহৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বেলঘরের বাগানে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে যান। তখন শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে লইয়া ঐ বাগানটিতে ঈশ্বরাধনায় তন্ময় থাকিতেন'।

কেশব সন্দর্শনে বেল-ঘরের বাগানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ।

ভক্তিভাজন ধর্ম্মাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে,—"১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলঘরিয়ার বাগানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের

সহিত কেশববাবুর পরিচয় হয়। পরমহংস দেবের কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া, তিনি বৈরাগ্য সাধন করিতে আরম্ভ করেন এবং গোস্বামী প্রভুকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। পত্র পাইয়া গোস্বামী প্রভু কলিকাতায় আগমন করতঃ দেখিলেন যে, কেশববাবু স্বহস্তে রন্ধন করেন এবং সময় সময় একতারা বাজাইয়া ভজন করেন। পরমহংস দেবের আলোকসামান্য সাধুতা দর্শন করিয়া কেশববাবু এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, একদিন ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া ফুল চন্দনাদি দ্বারা পরমহংস দেবের পদপূজা করিয়াছিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী কালে একদিন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "কেশব বাবু যদি তখন উঁহাকে (পরমহংস দেবকে প্রকাশ্যে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এতদিন ব্রাহ্মসমাজ উদ্ধার হইয়া যাইত"। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া পরমহংসদেবও বলিয়া ছিলেন,—"আজ আমাকে কেশব পূজা ক'রেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, পাছে উহার দলের লোকেরা টের পায়। ও যেমন দরজা বন্ধ ক'রে পূজা ক'ল্লে, তেমনি ও'র দরজাও বন্ধ থাক্‌বে"। [শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সাধনা ও উপদেশ। শ্রীঅমৃতলাল সেন গুপ্ত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সন ১৩২২ সাল।]"

শ্রীশ্রীঠাকুর ও কেশব প্রসঙ্গ। কেশববাবুর দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপূজা। ঐ বিষয়ে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা।

জগদম্বার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীকেশব-সন্দর্শনে উপস্থিত হন। তাহার ফলে কেশববাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক পুণ্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া নিজ পরিচালিত "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বক্তৃতায় জনসাধারণের নিকট শ্রীশ্রীদেবের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। তদ্‌বধি দেশের ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাগণ ক্রমে ক্রমে কাঙ্গালের দয়াময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জানিবার এবং বুঝিবার মহা সুযোগ পান। নেপালের কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। তাহার কিছুদিন পর, সিঁতির মহেন্দ্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয় ও গোপাল চন্দ্র মণ্ডল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), কৃষ্ণনগরের কিশোরী, কাশীপুরের মহিম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে আসেন।

জগদম্বার আদেশ। মহেন্দ্র পাল, গোপাল মণ্ডল, মহিম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে আগমন।

১৮৭৯ ও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সেবকেরা তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। ভক্তবর মনমোহন মিত্র ও ডাক্তার রামচন্দ্র দাস দত্ত ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে আসেন। এইরূপে একে একে ছাপ্‌রার রাক্তুরাম চৌধুরী বা লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), নিত্যগোপাল বসু [উত্তর কালে ইনি একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিয়া নিজেকে 'অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী'-নামে

অভিহিত করিয়া তাহার নেতা হন।], বারাসতের শ্রীতারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ দাস দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), বসীরহাটের রাখাল চন্দ্র দাস ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), আঁটপুর, হুগলীর বাবুরাম দাস ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ), ময়াল, হুগলীর (১) শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও (২) শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামী সারদানন্দ), দক্ষিণেশ্বরের যোগীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ), বারাসতের নিরঞ্জন দাস ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), কলিকাতার শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ঘোষ (স্বামী সুবোধানন্দ), বেলঘরিয়ার শ্রীহরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ), কলিকাতার শ্রীগঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ), কলিকাতার শ্রীকালীদাস চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), কলিকাতার সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, "উদ্বোধন"—মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক), কলিকাতার হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরীয়ানন্দ), কলিকাতার শ্রীতুলসী চরণ দাস দত্ত (স্বামী নির্ম্মলানন্দ), দক্ষচরণ দাস বিশ্বাস (স্বামী জ্ঞানানন্দ) প্রভৃতি শ্রী শ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসেন

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ ১৮ জন সেবকের আগমন—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শ্রীতারকনাথ ঘোষাল ইত্যাদি।

"ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি" লেখকের স্বর্গীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব হরমোহন মিত্র তাঁহার একখানি ইংরাজি পুস্তিকায় শ্রী শ্রীঠাকুর

সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"Eighteen of his followers, intelligent and well educated young men, have become ascetics and are practising devotion not only in Barnagore, but in holy places all over India and in the Himalays." ভাবার্থ,—"বুদ্ধিমান এবং সুশিক্ষিত তাঁহার ১৮ জন যুবক-শিষ্য কেবল বরাহনগরেই নহে, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত পবিত্র স্থানে এবং হিমালয়ে যোগাভ্যাস করিতেছেন"।

প্রবন্ধ-লেখকের স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রসঙ্গ। শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন গৃহীভক্ত ও বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ প্রমুখ দিগের তিনি একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ গুরুভাই ছিলেন।

তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী-ভক্তদিগের মধ্যে একজন গণ্য ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি মহারাজগণের তিনি একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ গুরুভাই ছিলেন। [জন্ম—আড়বালিয়া, মাতামহাশ্রমে, শকাব্দা ১৭৮৩, সন ১২৬৮, ২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ইং ১৮৬১, ৬ আগষ্ট। মৃত্যু—১৩ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়, সন ১৩১২ সাল, ইং—২৭শে মে, ১৯০৫। [ঐদিন অপরাহ্ণ ২॥০ টার সময়, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা, বিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারক, আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও পরলোক গমন করেন।] আড়বালিয়া গ্রাম

জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিবিসনের অধীন। তাঁহার পিতার নাম ৺গোবিন্দপ্রসন্ন মিত্র। পিতামহের নাম ৺জয়কৃষ্ণ মিত্র। শ্রীপাট পানিহাটার তাঁহারা মিত্র-কুলোদ্ভব। তাঁহার পিতামহ কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার ৺শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। বিখ্যাত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন শিব নারায়ণ ঘোষ। আড়বালিয়ার বিখ্যাত জমিদার ৺রামগতি নাগচৌধুরী মহাশয় সাধু হরমোহনের মাতামহ। "সাধু হর-মোহন"—সম্বন্ধে এখানে একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হইল। একাদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩১৪ সালের শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবক-মণ্ডলী সম্পাদিত বিখ্যাত ধর্ম্মপত্রিকা "তত্ত্ব-মঞ্জরী"তে পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজের প্রিয়-শিষ্য ও সেবক হাওড়া কোর্টের উকিল, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্য-বন্ধু, কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, বি, এল মহাশয় এই কবিতাটির রচয়িতা।]

"বিষয়-ব্যবসা-বুদ্ধি-বিহীন সুজন প্রশান্ত সরল সাধু ভাব-প্রচারক॥
সুখে দুঃখে সমভাব অচল অটল। রামকৃষ্ণ বার্ত্তাবহ মহাভক্তিমান্
দরিদ্র আতুর-সেবাব্রত আজীবন অনাসক্ত অহঙ্কার-বর্জ্জিত অন্তর।
প্রভু ইচ্ছা শিরোধার্য্য পরম মঙ্গল॥ গুরুভক্ত দরশনে বিহ্বল পরাণ
ভালবাসা জীবমাত্রে অন্তর উদার প্রভু-পুঁথি উক্তিগাথা দানে অকাতর॥
রামকৃষ্ণ-ধর্ম্ম-শ্রুতি-স্মৃতি-প্রকাশক। ভ্রমহ ভকত-ভৃঙ্গ! প্রেমিক প্রধান।
ভক্তনিন্দা অনিমিষ আশীবিষ যাঁর গুরুপদ-শতদলে নিশিদিন মান॥"

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তবর মনমোহন মিত্র এবং ভক্তবীর ডাক্তার রামচন্দ্র দাস দত্তকে তাঁহার নিজজন মধ্যে পাইয়া তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণের অনেককে একে একে উত্তরকালে তাঁহার নিজের স্বগণভুক্ত করিয়া লন। এই সূত্রে মনমোহন বাবুর মাস্তুতো ভাই নৃত্যগোপাল বসু মহাশয়ের ধর্ম্মের খুব উচ্চ অবস্থা শ্রীশ্রীঠাকুর লক্ষ্য করেন। রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া আছে। দুঃখের বিষয় উত্তরকালে নৃত্য মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান না করিয়া একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসঙ্ঘের নেতা হন। কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী মনোহর পুকুরের মহানির্ব্বাণ মঠ তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। ঐ খানেই বঙ্গাব্দ ১৩১৭ সালের ৭ই মাঘ তাঁহার নশ্বর দেহের সমাধি হয়। বঙ্গাব্দ ১২৬১ সালের ১৩ই চৈত্র শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা পূজার দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগীরথীর পূর্ব্ব-উপকূলে অবস্থিত শ্রীপাট পানিহাট তাঁহার জন্মস্থান। এই পানিহাট বা পেনিটিতে কাঙ্গালের পতিতপাবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার বৈষ্ণবদিগের উৎসবে যোগদান করেন। কোন্নগরের অপর পারে পেনিটিগ্রাম। নিত্য মহারাজ বা অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী মনমোহন ও রামের বড় মাসীমার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের শ্রীপাট পানিহাটীতে গমন। মনমোহন ও রামের মাতামহাশ্রম। নিত্য-গোপাল বসু বা অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীর বিবরণ।

পেনিটির ৺নবীনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহাদিগের একমাত্র মাতুল ছিলেন। তাঁহাদিগের মাতুলাশ্রমের সকলেই কাঙ্গালের শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। নবীনকৃষ্ণ ঘোষ কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ীর অলঙ্কার মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। মনমোহন ও রামের দুইজন মামাতো ভাই ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারাও ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

৪

জননী ভবতারিণীর আদেশ—'এইটি তোমার ছেলে'!

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-সহচর সংসারত্যাগী যুবকগণ তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবেশে দেখিতে পাইতেন যে,—জননী ভবতারিণী একটি ছেলেকে আনিয়া তাঁহার কোলে দিয়া বলিতেছেন—'এইটি তোমার ছেলে'!

ত্যাগী মানসপুত্র।

জগদম্বার ঐরূপ অভয় কৃপা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। জগজ্জননীকে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করেন, "সে কি মা! আমার আবার ছেলে কি? আমি নিজেই ত তোমার আব্দারে ছেলে। মার আব্দারে ছেলের কি ছেলে মেয়ে

হয়”? করুণাময়ী মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, ‘সাধারণ সংসারীর ন্যায় ছেলে নয়,—ত্যাগী মানসপুত্র’। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলেন যে, ‘শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরূপ দর্শনের অব্যবহিত পরে রাখাল বা ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁহার নিকট আগমন করেন’।

শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে প্রথম দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারেন। পরে ভাবাবেশে সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈস্বরে জননী ভবতারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ‘ওমা! তুমি যা’কে ইতিপূর্ব্বে দেখাও, এ যে দেখ্‌ছি সেই বালক’! ইহার বহু পরে তিনি নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার, পূর্ণ, বলরাম, রাম, মনমোহন, নিত্যগোপাল, হরমোহন, কালীপদ, গিরিশ, দেবেন্দ্র মজুমদার, মহিম চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র কবিরাজ, কিশোরী গুপ্ত, বিজয়াদি ব্রাহ্মভক্তগণ, তারক, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, বুড়োগোপাল, লাটু, নিরঞ্জন প্রভৃতির নিকট বহুবার বলিয়াছেন, “এই রাখালই সেই বালক! ও এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমাকে (পরমহংসদেবকে) শ্রীশ্রীজগদম্বা দেখাইয়া দেন”। শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহারই নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে অভিহিত হন।

এই রাখালই সেই বালক। ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে অভিহিত।

পুত্রের এবং ভগ্নীপুত্রদের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া

মনমোহন-জননী শ্যামাসুন্দরী বলিয়াছিলেন, "দেখ, তিনি সাধু মহাত্মা নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় উনিই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন। এই লীলায় সেই মহাপ্রভুই শ্রীদক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন-মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রূপে আগমন করিয়া জীব উদ্ধার করিতে লীলা করিতেছেন"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং ভগবান।

পরম পূজনীয়া মাসীমাতা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া নিত্য-গোপাল ও রামদত্ত কাঙ্গালের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একদিনের জন্যও সাধারণ মনুষ্যজ্ঞান করেন নাই। ভক্তবর মনমোহন তৎ-পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান ধারণাতে তন্ময় হইয়া যান। মনমোহন ও রাম উত্তর-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রাম মনমোহনের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দস্বামী লেখাপড়া ছাড়িয়া যখন কাঙ্গালের শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট থাকিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় একদিন রাম তাঁহাকে বলেন, "দেখ, রাখাল! তুমি বহুবাজারের বিজ্ঞান-মন্দিরে বক্তৃতা শ্রবণ করো, তাহাতে তোমার অনেক কাজ হ'বে"। রামের কথায় রাখাল সায় দিল না। ইহা দেখিয়া মনমোহন দয়াময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তজ্জন্য নানা তর্কবিতর্ক করেন। তাহার ফলে

তিনি বুঝিলেন যে, রাখালের পক্ষে কোন অর্থকরী বিদ্যাচর্চ্চা ও অর্থোপার্জ্জন করা বা কামিনী ও কাঞ্চনের সংস্রবে থাকা উপযুক্ত নহে। ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত স্বতন্ত্র বুঝিয়া তিনি তর্ক করিতে বিরত হন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই বিষয় লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরও মনমোহনকে অনেক কথা বলেন। তদবধি ঐ বিষয়ে মনমোহন নিরস্ত হইয়া যান। মনমোহন তখন হইতে বুঝিলেন যে, তাঁহার ভগ্নীর চিরকালের জন্য কপাল পুড়িল। এই প্রসঙ্গে মনমোহনের পিসীমা একদিন শ্যামাসুন্দরীকে বলেন, "দেখ,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অবস্থান। ঐ বিষয়ে মনমোহনের তর্ক। মনমোহন জননী শ্যামাসুন্দরীর কথা"—আমার এমন কি সৌভাগ্য হ'বে যে, —আমার ছেলে, আমার জামাই ওঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে"।

বউ! তোমার ছেলে জামাই এত ঘন ঘন যে, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যায়—তার ফলেই ত রাখালের সংসার-বৈরাগ্য হয়েছে। সংসারীর পক্ষে সাধুসঙ্গ অতো ভাল দেখায় না। তুমি আর ওদের সেখানে যেতে দিও না"। ননদিনীর ঐ কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী তখনই বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরঝি! কার কাছে ওরা যায়—তা বোঝ্‌বার শক্তি তোমার নাই। তোমার এ জীবনে তা আস্‌বেও না। আমার এমন কি সৌভাগ্য হ'বে যে, আমার ছেলে, আমার জামাই তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) সেবায় জীবন উৎসর্গ কর্‌বে"।

ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরীকে আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণ স্ত্রীলোক মধ্যে গণ্য করেন নাই। তাঁহার উচ্চ আদর্শ জীবনের অনেক তত্ত্বকথা তিনি অনেকের নিকট বলিয়া গিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরীর চরণরেণু পাইয়া অনেকে কৃতার্থ হইয়াছেন। ধর্ম্ম-সমাজের ইতিহাসে তাঁহার স্মৃতি-কথা বরাবর স্মরণীয় ও বরণীয় থাকিবে।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রথম প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলে তাঁহার পিতা বড়ই অসন্তুষ্ট হন। পরে তাঁহার সেই অসন্তুষ্ট ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় চলিয়া যায়। ভক্তবর মনমোহন মিত্র মহাশয়ের পরম ভক্তিমতী জননী-দেবী, স্ত্রী এবং ভগ্নীগণ প্রভৃতির শ্রীদক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত থাকাতে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার সেজমেয়েকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া যান। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের পত্নীকে দেখিয়া কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় ঘটাইতে পারিবে না"। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে (শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে) বলিয়া পাঠান, "টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে"।

পিতার অসন্তুষ্ট ভাব। ব্রহ্মানন্দের পত্নী-দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,— "দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্ম্ম-পথের অন্তরায় ঘটাইতে পারিবে না"।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুদেব মাঝে মাঝে বল্‌তেন, "আমি অনেক দিন হ'ল এখানে এসেছি! তোর এত বিলম্ব কেন? তোর এখানে আসতে এত বিলম্ব হ'ল কেন"?

৫

শ্রীশ্রীপ্রভুদেব ছিলেন বালক-স্বভাবের। ঈশ্বর-দর্শন হ'লে বালকের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যে যাহার চিন্তা করে তাঁহার সত্ত্বা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের

বালক-স্বভাবের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

ন্যায় সরল। বালক যেমন খেলাঘ গড়ে, ভাঙ্গে—তিনিও তদ্রূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশবর্ত্তী নয়,—তিনিও তেম্‌নি সত্ত্ব রজঃ ও তমর অতীত। ভাবাবেশে শ্রীশ্রীপ্রভুদেব বল্‌তেন—"স্বভাব আরোপের জন্য পরমহংসরা পাঁচ দশ জন বালক সঙ্গে রাখেন"।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীপ্রভুদেব বহুবার সমাধিস্থ হইয়াছেন। "দেখিস্ তুই যেন পড়িস্ নে—মান করে যেন ঠকিস্ নে"!

"দেখিস্ তুই যেন পড়িস্‌নে—মান করে যেন ঠকিস্ নে"!

প্রভৃতি কত কথাই ভাবাবেশে তিনি তাঁহাকে বল্‌তেন, এবং বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) অঙ্গে পুলক বহিত।

গিরীন্দ্র ও নগেন্দ্র মিত্র। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান ও অজ্ঞান বোধ।

ভক্তবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র* মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র নাথ মিত্র এবং তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র নগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীপ্রভুদেব দর্শনে আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে বলেন—"রাখালের জ্ঞান ও অজ্ঞানবোধ জন্মেছে—অসৎ ও সৎ বিচার লাভ হয়েছে। এখন তাকে বলি—বাড়ীতে যা, কখনও বা মাঝে মাঝে এখানে এলি ও দু'চার দিন থেকে গেলি"।

---

* বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ইনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ মঠ বরাহনগরের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দত্ত মহাশয়ের এক ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ মঠই বরাহনগর গ্রামের উত্তরপাড়ায় আলমবাজারে উঠিয়া যায়। এখন যেখানে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মিত্র মহাশয় অবস্থান করিতেছেন, ঐ বাড়ী। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ মঠই ঐ বাড়ী হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে উঠিয়া যায়। বরাহনগরের অপর পারে বেলুড় গ্রাম। হাওড়া ষ্টেসন হইতে চার মাইল উত্তরে। বড়বাজার ঘাট হইতে পোর্ট-কমিশনারের খেয়াজাহাজেও বেলুড়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে যাতায়াতের সুব্যবস্থাও ১৩২৮ সালের ১৬ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজার দিন হইতে শ্রীশ্রীমহারাজজী করিয়া গিয়াছেন। এখন আর পূর্ব্বেকার ন্যায় যাতায়াতের কোনই কষ্ট নাই। এক ঘণ্টা অন্তর খেয়াজাহাজ বড়বাজার হইতে ছাড়ে। শ্রীমঠে আসিবার জাহাজ ভাড়া ৵১৫ সাত পয়সা। শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠবাড়ী দর্শনে আসিয়া এবং তৎসঙ্গে পরের জাহাজে শ্রীদক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন মন্দিরটিও প্রদক্ষিণ করিয়া অনেকেই বর্ত্তমানে তন্ময় হইয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীদেবের অপার করুণায় জনসাধারণের মন ঐ দুই পবিত্র স্থানে গিয়া কত যে শান্তিসুধা উপভোগ করিতেছে তাহাও আমরা নিত্য দেখিতেছি। ধন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা!

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীপ্রভু-দেব ভক্ত-সঙ্গে পঞ্চবটীমূলে একদিন কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেন। ঐখানে ঐদিন গান খুব জমে—তাহাতেই সকলে খুব তন্ময় থাকেন। পরে তথা হইতে উঠিয়া তিনি ঝাউতলায় যাইবার কালীন স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজকে তাঁহার ছাতি উঠাইয়া ঘরে রাখিয়া আসিতে বলিয়া যান। স্বামী অদ্বৈতানন্দ আবার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর ঐ হুকুমটি চালান। তিনি তখনও শ্রীশ্রীপ্রভু-কথায় তন্ময়, ছাতি আনার কথা বিস্মৃত হইয়া গেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুদেব এদিকে ঝাউতলা হইতে নিজ কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হ্যাঁগা, ছাতিটা কি এনেছ"?

ছাতির কথা। "রাখাল বলে ১৩ইকে ১১ই"। "গোপাল গরুর পাল"।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলিলেন, "আজ্ঞা না, আন্‌তে ভুলে গেছি। সেটা সেখানেই প'ড়ে আছে"। তিনি ছাতি আনিতে তাড়াতাড়ি পঞ্চবটীতে গেলেন। ছাতি লইয়া তিনি শ্রীশ্রীপ্রভু-সকাশে উপস্থিত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি যে এত এলোমেলো, তবু অতদূর নই! রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় বলে ১৩ইকে ১১ই। আর গোপাল—গরুর

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,—"আমি যে এত এলো-মেলো তবু এতদূর নই"!

পাল"! সভাস্থ কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না—গোপাল গরুর পালই বটে!

সিঁতির গোপালচন্দ্র মণ্ডল উত্তর জীবনে শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া 'স্বামী অদ্বৈতানন্দ'-নামে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে মিলিত হন। শ্রীশ্রীপ্রভুদেব তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। সেইজন্য 'বুড়ো গোপাল' বলিয়া তিনি সকলের নিকট সুপরিচিত। বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সালের ১৩ই পৌষ তিনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সাতাত্তর বৎসর হইয়াছিল। গৃহী ও ত্যাগী সকল ভক্তগণের অপেক্ষা বয়সে তিনি বড় ছিলেন। [এই গ্রন্থের মুখপত্রে "অন্তরঙ্গ স্বগণসহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব" নামে যে চিত্রখানি রহিয়াছে, তাহারই সর্ব্বশেষে স্বামী অদ্বৈতানন্দ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ১১ জনের মধ্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ অন্যতম। উঁহাদের সকলকে কাশীপুরের বাগানে তিনি স্বহস্তে সন্ন্যাস দেন।]

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুদেব বলেন, "এই খানে বসে পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বল্‌ছিল। সেই সকল কথা শুন্‌তে শুন্‌তে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্‌তে লাগলো। তারপর একেবারে

সমাধিস্থ। বলরামের বাড়ীতে দ্বিতীয় বার তার ভাব-সমাধি হয়। ভাবেতে তন্ময় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। রাখালের ঘর সাকারের। নিরাকারের কথা শুন্‌লে উঠে যাবে। তার জন্য মা চণ্ডীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর করে ছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে আমিই মাঝে মাঝে তাকে পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের বাকি যে ছিল"।

রাখালের প্রথম ভাব ও সমাধি। রাখালের ঘর সাকারের। নিরাকারের থাকে ও নয়।

* * * *

"রাখাল-বনিতা যাঁর বিশ্বেশ্বরী নাম॥
অচলা ভকতি তার প্রভুর চরণে।
যখন তখন আসে প্রভু দরশনে॥
রাখাল বিশাই দুয়ে নিজের প্রভুর।
দিনেকে দুজনে পেয়ে লীলার ঠাকুর॥
জিজ্ঞাসা করিলা ধীরে সহাস্য আননে।
কাহার বাসনা কিবা আছে মনে মনে॥
দীন ক্ষীণ মৃদুভাবে কহিল বিশাই।
হৃদয়ে বাসনা মোর কিছুমাত্র নাই॥
জানিতে বারতা কিবা রাখালের মনে।
প্রভুর কটাক্ষপাত হৈল তাঁর পানে॥
সঙ্কেতে অঙ্গুলি এক তুলিয়া তখন।
প্রার্থনা করিলা এক পুত্রের কারণ॥

সত্বর পাইবে পুত্র * পূর্ণ হবে সাধ।
এত বলি ঠাকুর করিলা আশীর্ব্বাদ ॥
অবতারে এ লীলায় প্রভু নারায়ণ।
অহেতুক প্রেম যেন কৈলা প্রদর্শন ॥"

মহিম চক্রবর্ত্তীর 'ব্রহ্মচক্র' রচনা। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের বিশেষ ভাবাবস্থা। তাঁহার বুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত বুলান।

মহিমাচরণ নামে সুপরিচিত কাশীপুরের মহিম চক্রবর্ত্তীর হৃদয়-অভ্যন্তরে এক সাধের প্রেরণা হয়। শ্রীশ্রীদেবের অনুমতি পাইয়া তাঁহার সমক্ষে ও তাঁহার কক্ষে চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিশোরী গুপ্ত, মহেন্দ্র মাষ্টার, রাখাল এবং আরও কয়েকটি ভক্ত লইয়া ঘরের মেঝেতে এক চক্র করেন ও সকলকে ধ্যানে নিমগ্ন হইতে আদেশ করেন। ঐ ধ্যানে বসিবামাত্র শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের এক বিশেষ ভাবাবস্থা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি নিজের ছোট তক্তাবোস্ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার আদরের প্রিয় সন্তান শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে জগদম্বার নাম জপ করিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ ঐরূপ করিলে পর, শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের ভাব সম্বরণ হয়।

* এই পুত্রের আবির্ভাব হয় বঙ্গাব্দ ১২৯২ সালে। ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে সত্যচরণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণালোকে মিশিয়া গিয়াছে। দেবী বিশ্বেশ্বরীর দেহত্যাগ হয় ১২৯৮ সালের কার্ত্তিক মাসে। ১৩০৩ সালের ১৫ই চৈত্র তারিখে সত্যচরণের পিতামহ আনন্দমোহন ঘোষ মহাশয়ও ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লীলাসংবরণ করেন সত্যচরণের মহাপ্রস্থানকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ১১ বৎসর।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি শ্রীদক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন-মন্দিরে কেশববাবুর ব্রাহ্ম সমাজের অমৃতলাল বসু, সুগায়ক ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাস, (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে কথোপকথনকালে কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতে থাকেন,

ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে কথোপকথন কালে 'নিত্যসিদ্ধ'-বর্ণনা।

"নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ। উহাদের ভক্তি আজন্ম। উহারা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, উহাদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভাল-বাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়। নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদাদি। সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তি করে। আবার দেখা যায়, সংসারেও আসক্ত হয়—কামিনী ও কাঞ্চনে ডুবে মাছি যেমন ফল, ফুল, সন্দেশ ও বিষ্ঠাতেও উঠে। নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি। ফুলের উপর বসে কেবল মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ রস পান করে,—বিষয় রসের দিকেও যায় না। সাধ্য সাধনা ক'রে যে ভক্তিলাভ, এদের সে ভক্তি নয়। রাগভক্তি, প্রেমভক্তি, ঈশ্বরের উপর আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে, আর কোন বিধি নিয়ম থাকে না। নরেন্দ্র,

নরেন্দ্র, রাখাল এরা নিত্যসিদ্ধ। ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা বাড়ার ভাগ।

রাখাল প্রভৃতি এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ”।

৬

শ্রীম, মণি বা মাষ্টার একই ব্যক্তির নাম। এখনও তিনি মানবশরীরে আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু-দেব তাঁহাকে অনেক কৃপা করিয়াছেন। কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বিখ্যাত মর্টন ইনিষ্টিটিউসনের বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বলেন, “রাখালের এমনি স্বভাব হ’য়ে দাঁড়াচ্চে যে তাকে আমায় জল দিতে হয়। আমার সেবা কর্‌তে বড় পারে না।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক অবস্থার আলোচনা।

* * * * *

রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি আর ও আসক্ত হবে না। বলে, ‘ও সব আলুনি লাগে’। ওর পরিবার এখানে এসেছিল—১৪বৎসর বয়স। এখান হ’য়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে। ও গেল না। বলে,—‘আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগে না’। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন এদের ব্যাটা ছেলের ভাব”। [স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম ১১জনের অন্যতম। কাশীপুরের বাগানে

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে বঙ্গাব্দ ১৩১১ সালের ২৭শে বৈশাখ অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণালোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।]

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের অসুস্থতা, বৃন্দাবন যাত্রা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জগদম্বার নিকট প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে আসিবার বছর তিন পর, শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ শারীরিক অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি ভক্তবর বলরাম বসু মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন। পতিতপাবন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! ও ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না। তাই জন্য মাঝে মাঝে অভিমান করে. যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে সরাইয়া রাখিস, তা'হলে কোন একটি ভাল জায়গায় মনের আনন্দে সে যেন ভাল থাকে"!

শ্রীবৃন্দাবন ধামে অবস্থান কালীন ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজজীর শরীর গতিক ভাল নয় শুনিয়া দয়াময় শ্রীশ্রীঠাকুরের তাঁহার জন্য বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হয়। তাহার পূর্ব্বে কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরকে জগদম্বা দেখান, 'ঐ রাখালই ব্রজের রাখালরাজ'! যেখান হইতে তিনি এখানে আসিয়াছেন, পুনরায় সেখানে যাইলে তাহার

পূর্ব্বস্মৃতি উথলিয়া পাছে শরীর যায়, এই বিশেষ ভাবনায় ভাবিত হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীপ্রভুদেব তাঁহার জন্য জগন্মাতা শ্রীশ্রীভবতারিণী সমীপে বিশেষ করিয়া প্রার্থনাদি করেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা অভয়দানে আশ্বস্ত করিলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

কাঙ্গালের পতিত পাবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা দেখান —"ঐ রাখালই ব্রজের রাখালরাজ" !

৭

* * * *

"প্রভুর মানস পুত্র শ্রীরাখাল নাম ॥
চোদ্দ কি পনের বর্ষ * বয়ঃক্রম তাঁর
বিষয় সম্পত্তি ঘরে বাপ জমিদার ॥
দোহারা গড়নখানি সরল মধুর।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গেতে বহু সাদৃশ্য প্রভুর ॥
হারা ছেলে পুনরায় ফিরে এলে ঘর।
মহোল্লাসে ভাসে যেন পিতার অন্তর ॥

* তখন তাঁহার কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম। উনিশ বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের ঠিক এক বর্ষ পরে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকারের মতে '১৮৮১র শেষভাগে ও '১৮৮২র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন'।

তাঁহারে দেখিয়া তেন প্রভুর আমার।
উথলে আনন্দ, হৃদে নাহি ধরে আর॥
সম্বরেন সুখবেগ নিজে প্রভুরায়।
একবারে ধরা কারে না দেন লীলায়॥
লুকাচুরি খেলা কত হয় কি কারণ।
বুঝেছ কি হেতু কিছু দৃষ্টিহীন মন॥
এখন' যদ্যপি আছ দৃষ্টিপথে কাণা।
একত্রে দুহাতে ধর দাড়িম্বের দানা॥
ধীরে ধীরে দন্তের পেষণে খাও কারে।
কারে কর উদরস্থ গিলে একবারে॥
তবে না বুঝিবে মর্ম্ম, প্রভু কি কারণে।
সহজে না দেন ধরা প্রথমে প্রথমে॥
শ্রীমন মোহনে কন শ্রীপ্রভু আমার।
দেখ এই রাখালের সুন্দর আধার॥
এখন শ্রীরাখালের বিদ্যার্জ্জন কাল।
লেখা পড়া ছিল তাঁর বড়ই জঞ্জাল॥
যা কিছু সামান্য যত্ন বিদ্যাভ্যাসে ছিল।
শ্রীপ্রভুর দরশনে সে টুকুও গেল॥
বিদ্যালয়ে নাহি মন যাওয়া হয় নামে।
সে কেবল এক মাত্র পিতার শাসনে॥
কোন দিন বিদ্যালয়ে ছুটি পেলে পর।
পুনরায় ফিরে নাহি যাইতেন ঘর॥

বরাবর আসিতেন দক্ষিণসহরে।
থাকিতেন দুই তিন দিন একেবারে ॥
হেন আচরণে, ঘরে জনক তাঁহার।
দেখা পেলে করিতেন কত তিরস্কার ॥
আটকে রাখেন তাঁয় আপনার ঘরে।
আসিতে না পান যেন দক্ষিণসহরে ॥
হেথা অতি বিষাদিত প্রভুগুণমণি।
রাখালের তরে চিন্তা দিবস যামিনী ॥
উঠিল প্রবল টান, সে টানের জোরে।
বেগে গিয়া ঢুকিতেন কালির মন্দিরে ॥
প্রার্থনা হইত কত বারি দুনয়নে।
বিদরে হৃদয় মাগো রাখাল বিহনে ॥
ভক্ত-প্রাণ ভক্ত-প্রিয় প্রভু ভগবান।
সন্দেহ মোচনে কব বহুল প্রমাণ ॥
স্বার্থশূন্য প্রভুদেব, কোন স্বার্থ নাই।
ভক্ত হেতু স্বার্থপর সর্ব্বদা গোসাঁই ॥
যবে যা প্রার্থনা প্রভু করেন শ্যামায়।
তখনি পূরণ হয় তাঁহার ইচ্ছায় ॥
শ্যামায় তাঁহায় মন কোন ভেদ নাই।
একরূপে শ্যামারূপ, অপরে গোসাঁই ॥
মনে প্রাণে ভাবে অঙ্গে দোঁহে ঠিক একা।
দোঁহার মধ্যেতে দোঁহে পরস্পর ঢাকা ॥

দেখিতে যদ্যপি সাধ হয় তোর মন।
সরলে স্মরহ প্রভু তম-বিমোচন॥
শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা যেন, কি কল কৌশলে।
আনিয়া দিলেন কালি তাঁহার রাখালে॥
সমনে শুনিলে ঘুচে লোচন-আঁধার।
রামকৃষ্ণলীলাগীত অমৃত-ভাণ্ডার॥
রাখালের পিতার অনেক জমিজমা।
বিষয় সম্বন্ধে এক উঠে মকর্দ্দমা॥
অতিশয় বিপদ, হইলে পরাজয়।
দিবানিশি ভেবে সারা অন্তরেতে ভয়॥
মিছিলের অবস্থার বড়ই দুর্দ্দশা।
পরপক্ষ বলবান, নাহি জয়-আশা॥
কেহ নাহি কয় তাঁয় জিনিবে মিছিল।
বড় বড় বিধিবিৎ কৌশলী উকীল॥
অন্য চিন্তা নাই, এই চিন্তা নিরন্তর।
তন্ময়ত্ব তাহে, নাই ঘরের খবর॥
এসময় অবসর পাইল রাখাল।
পিতার জঞ্জালে সব ঘুচিল জঞ্জাল॥
প্রভুর নিকটে তবে থাকেন এখন।
দেখিয়াও পিতা নাহি করেন বারণ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কিবা হইল এমনি।
জিনিবার নহে যাহা জিনিলেন তিনি॥

মনে মনে বুঝিলেন জয়ের কারণ।
সাধুর নিকটে যায় তাঁহার নন্দন॥
সাধুর কৃপায় এই মকদ্দমা জিত।
ষোল আনা পাকা জ্ঞানে ধারণা নিশ্চিত॥
ঘুচিল পূর্ব্বের ভাব মঙ্গল-লক্ষণ।
রাখালে এখন নাই কোন নিবারণ॥
অবাধে কাটেন কাল প্রভুর গোচরে।
কর্ম্ম তাঁর প্রভু সেবা ভক্তিসহকারে॥
তদুপরি শ্রীপ্রভুর বাৎসল্য সঞ্চার।
সম্বোধিয়া ডাকিতেন গোপাল তাঁহার॥
রাখাল বিহনে যেন গাভী বৎসহারা।
হইল রাখাল দুটি নয়নের তারা॥
গোপাল গোপাল বলি কতই আদর।
আলিঙ্গন বসাইয়া কোলের উপর॥
ভাবেতে কখন প্রভু এতই উন্মত্ত।
কাঁধেতে করিয়া তাঁয় করিতেন নৃত্য॥
মরি কি মধুর খেলা কি কহিতে পারি।
ধরায় সসাঙ্গোপাঙ্গ নরদেহ ধরি॥
নূতন সম্পর্ক নয় আপ্তগণ সনে।
চিরকাল বাঁধা, না চিনালে কেবা চিনে॥
হীন হেয় জীব বুদ্ধি বড় পরমাদ।
বুঝে না বীজের মধ্যে ফলের আস্বাদ॥

আছে হেন বহু বুদ্ধি সৃষ্টির ভিতরে।
পূর্ব্ব-জন্ম পর-জন্ম স্বীকার না করে॥
হায় কি বিষম বুদ্ধি যার বিবেচনা।
কারণ বিহনে হয় কর্ম্মের সূচনা॥
বিনা কর্ম্মে ফল হয় কি প্রকারে ভাষে।
মন-নাশ কর্ম্ম-নাশ দেহের বিনাশে॥
ভাল মন্দ যার যাহা সঙ্গে সঙ্গে রয়।
হোক না দেহের লক্ষ লক্ষ বার লয়॥
দেহান্তরে গুণান্তর কহে আহাম্মক।
এখানেতে টক্ যেবা সেখানেও টক্॥
স্বভাবে স্বভাব থাকে, স্বভাবের প্রথা।
বীজের ভিতরে যেন ফল ফুল পাতা॥
সম্পর্ক সমান ভাবে বাঁধা চিরকাল।
এখন রাখাল যিনি, পূর্ব্বেও রাখাল॥
ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে।
রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে॥
প্রভুর গোপাল তাঁর গুণান্তর নাই।
গোসাঁইর শ্রীরাখাল, তাঁহার গোসাঁই॥"

*   *   *   *

*   *   *   *

"বলরামে একদিন কন ভগবান।
দেখ গো রাখাল নামে অতি ভক্তিমান

পেয়েছি বালক এক সুন্দর প্রকৃতি,
শ্রীমন মোহন মিত্র তার ভগ্নীপতি ॥
যাও যদি একবার দেখে এস তাঁয়।
কাঁশারি পাড়ার কাছে থাকে সিমুলায় ॥
মহাভক্ত বলরাম স্থির-বুদ্ধি তাঁর।
প্রতি বর্ণে শ্রীপ্রভুর বুঝে আছে সার ॥
শ্রীবচন যতনে পালন যথা কালে।
যথা আজ্ঞা চলিলেন দেখিতে রাখালে ॥
পরস্পর দেখা শুনা, মন আকর্ষণ।
শুভক্ষণে দুঁহু জনে হইল মিলন ॥
নৈকট্য সম্বন্ধ দোহে ভিতরে ভিতরে
দিন দিন যায় যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ॥
ভক্তপ্রিয় বলরাম বৈষ্ণব আচারী।
ভক্তজনে পাইলে যতন বাড়াবাড়ি ॥
তাঁহার প্রকৃত ভাব নাই অহঙ্কার
মাশ্চর্য্যবিহীন চিত্ত যদি জমিদার ॥
সাধারণ রীতি ছাড়া, সদা দীন মন।
সুপ্রশস্ত সুন্দর দ্বিতল নিকেতন ॥*

---

* শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বগণের নিকট 'বলরাম ভবন' একটি মহাতীর্থ। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজজীর বলরাম নিকেতন বড়ই আদরের সামগ্রী। এইখানেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণালোকে মহাপ্রস্থান করেন। ঐ বাড়ীর চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে.

কত ভক্ত আসে যায় তাঁহার ভবনে।
যত্নবান সর্ব্বদা সাদর সম্ভাষণে॥
অতি পরিমিতব্যয়ী বুদ্ধিতে না আসে।
হিসাব দেখিয়া লোকে ব্যয়কুণ্ঠ ঘোষে।
সাদরে রাখেন তিনি রাখালে ভবনে।
সৌভাগ্য মানেন ঘরে রাখাল যে দিনে॥"

——শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

৮

তখন শ্রীশ্রীপ্রভুদেব শ্রীদক্ষিণেশ্বর-নিকেতনে অবস্থান করেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেন, "ওরে রাখাল, কিছু পান সাজনা; পান যে সাজা নাই।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ তদুত্তরে শ্রীশ্রীদেবকে বলেন, "পান সাজতে জানি না।" শ্রীশ্রীদেব বলিলেন, "সে কিরে, পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? পান সাজার আবার কিছু শিখ্‌তে হয়? যা, পান সেজে নিয়ে আয়।"

শ্রীশ্রীপ্রভুদেব বলেন,—"ওরে ও আমার দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস্‌নি! ওকে কোন কাজ করতে দেখ্‌লে আমার কষ্ট হয়, আর ওর প্রকৃতি বড় কোমল, ওকি কোন কাজ করতে পারে?"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় উত্তর দিলেন, "পারব না।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ঐ ছোট খাট উত্তর শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। পরে আবার বলিলেন, "সে কিরে

পারবিনি কি ? ওমন কথাও ত কখনও শুনিনি, পান সাজা— তাও জানিনা পারিনা। যা শীঘ্র করে একটা পান সেজে নিয়ে আয়।”

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাব যেন রাজপুত্র, জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপ্রভু-দেবের সঙ্গে তাঁহার খেলাধূলা ও পরমানন্দ করিবারই একমাত্র সম্পর্ক, আহ্লাদে আটখানা হইয়া কখন তাঁর কাঁধে উঠেন, আবার কখন কোলে বসেন, তাঁর সঙ্গে কত রকম যে খেলাধূলা চলে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পুনরায় ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে বিশেষ জিদ্‌ করাতে তিনি একটু বিরক্তভাবে উত্তর দেন, “পারব না মশায় মাপ্‌ কর্‌বেন.” শ্রীশ্রীদেব তাঁহার কথা শুনিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। অদ্ভুতানন্দজী তখন শ্রীশ্রীদেবের ঘরের ছেলের মধ্যে গণ্য হইয়া শ্রীদক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে কিছুক্ষণ ঐ আন্দোলনে মাতিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ তাঁহার সহিত ঐ বিষয় লইয়া ঝগড়ার সূচনাও করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীশ্রীদেব তাঁহাদের উভয়ের ঐ লীলা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “ও রামলাল, রাখাল-লাটুর যুদ্ধ দেখ্‌বি আয়।”

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামলালদাদা তথায় তাঁহাদের হাতাহাতি না দেখিয়া দেখিলেন, “রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ” শ্রীশ্রীদেবও তাহা দেখিয়া অবাক্‌।

অন্য কেহ তাঁহার স্নেহের দুলাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কোন কিছু কাজ কর্ম্ম করিতে ইঙ্গিত করিলে, তিনি বলিতেন, "ওরে, ও আমার দুধের ছেলে, ওকে তোরা এখানকার কোন কিছুকাজকর্ম্ম কর্‌তে হুকুম করিসনি। ওকে কোন কিছু কাজ কর্ম্ম করতে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি ওর প্রকৃতি জানি। বড় কোমল, ওকি কোন কাজ কর্ম্ম কর্‌তে পারে?"

স্বামী অদ্ভুতানন্দজী তাঁহাকে পান সাজিয়া আনিয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীদেবের যখন যে হুকুম হয়—তখনই তিনি তাহা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুসেবা করিতেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলিতেন, "নরেন ভাইয়ের, রাখাল ভাইয়ের, শশী ভাইয়ের, তারক-শরৎ-কালী প্রভৃতি গুরুভাইদের সেবা নিলে শ্রীশ্রীদেবে-রই সেবা লওয়া হয়। শ্রীশ্রীদেবেরই ইঙ্গিতে ত আছে, —'ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত একই জিনিষ'। তাঁর নরেন ভাইয়েব মানবশরীর যাওয়াতে তিনি কত যে কাঁদেন—সে সব প্রসঙ্গ এস্থানে আলোচনার আবশ্যকতা নাই। সেই সময় তিনি আমাদের কলিকাতার ৪০নং নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বাসা বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। মদীয় পিতৃদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলে তবে তাঁহার ঐ শোকাবেগ যায়। স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর মানবশরীর ৺কাশীধামে সন ১৩২৭ সালের ১১ই বৈশাখ অনুমান ৫৬।৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ত্যাগ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজজীর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সিদ্ধানন্দ মহারাজ স্বামী অদ্ভুতানন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত "সৎকথা" পুস্তকা-

কারে বাহির করিয়াছেন। উহা তত্ত্বপিপাসুর শান্তিজল। আপনারা সকলেতাহা পাঠ করিলে প্রাণে শান্তি লাভকরিবেন।

শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হয় না—এক লক্ষ্য হয় না—নানাদিকে মন চলাফেরা করে। ভক্তবর মনোমোহনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু-দেব বলিয়াছিলেন, "তুমি রাগই কর, আর যাই মনে আন—রাখালকে বল্লুম,—ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং শুনবো; তবু কারো দাসত্ব করিস্, চাকরী করিস্, সে সব কথা যেন না শুনি।"

সংসারীর দাসত্ব।

৯

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপ্রভুদেব তাঁহার সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্ম আমাদিগের মধ্যে দিয়া ক্রমশঃ শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। অনবরত দশবর্ষকাল শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রদত্ত অলৌকিক সত্য তত্ত্ব সমূহ প্রচার করিয়া তাঁহার শরীরটা যাই-বার উপক্রম হইতে লাগিল। হাড়, পুঁজ ও রক্তের খাঁচাটা আর কোন প্রকারে মেরামত করিয়া রাখা গেল না। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা আসিবার পর হইতে অন্তরঙ্গসেবকগণ তাঁহাকে

শ্যামপুকুর হইতে রাণী কাত্যায়নীর আত্মীয় গোপাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কাশীপুরস্থ উদ্যান বাটীকায় শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের আগমন। তথায় আটমাস অব-স্থানের পর শ্রীশ্রীদেব মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট।

চিকিৎসার্থ কালীপীঠ শ্রীদক্ষিণেশ্বর হইতে প্রথমে ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আনেন। তথায় তাঁহাকে কিছুদিন রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। পরে বলরাম ভবন হইতে অন্তরঙ্গ সেবকগণ তাঁহাকে শূরভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনের নিকটবর্ত্তী ৫৫নং বাড়ীটি ভাড়া লইয়া তথায় রাখেন। ঐ ভবনে তিনি কমবেশ তিনমাস কাল অবস্থান করেন। পরে ঐ ভবন হইতেই ডাক্তারের পরামর্শমত পরিসর বাটী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিয়া বঙ্গাব্দ ১২৯২ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাকে মহানগর কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ উদ্যানবাটীকা বড় রাস্তার উপর। চিৎপুরের বিখ্যাত শ্রীশ্রী৺চিত্রেশ্বরী এবং শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলামাতার মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। শ্রীশ্রীপ্রভুদেব জগন্মাতা ছাড়া একদিনও নন। তাই তাঁর ইঙ্গিতানুসারে সেবকগণ সহরের উত্তর উপকণ্ঠস্থ কাশীপুরে তাঁহাকে আনেন। বিখ্যাত লালাবাবুর পরম ভক্তিমতী পত্নী রাণী কাত্যায়ণীর আত্মীয় গোপাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐ উদ্যানবাটীকার মালিক। তাঁহার নিকট হইতে সেবকগণ উহা মাসিক কুড়ি গণ্ডা টাকা ভাড়া লন। এইখানে শ্রীশ্রীদেব আটমাস কাল অবস্থান করিয়া অপ্রকট হন। বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ তাঁহার মহাযাত্রা হয়।

শ্রীশ্রীদেব বীরভক্ত গিরীশ চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "দেখ, রাখাল-টাখাল বেশ এখন বুঝ্‌তে পেরেছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অনিত্য। ওরা যে মাঝে মাঝে সংসারে গিয়ে থাকে, সেটা এখানকার ভাব জেনে শুনে। স্ত্রী রয়েছে, ছেলেও হয়েছে, ঘরে অন্নের সংস্থানও আছে, বাপ কতবার গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসা যাওয়া করিতে লাগিল, সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। বলে কিনা সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা আমার দ্বারা আর হয়ে উঠ্‌বেনা। আমি জানি রাখাল-টাখাল ওরা আর সংসারে লিপ্ত হবে না।"

বীরভক্ত গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনকালে কাশীপুরের উদ্যানবাটিকায় শ্রীশ্রীপ্রভু দেবের স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।

কাশীপুর শবদাহ ঘাটে শ্রীশ্রীদেবের মানব শরীর দাহ করা হয়। পরে ঐ চিতাভস্ম, শ্রীশ্রীদেবের ব্যবহৃত জিনিষ পত্র প্রভৃতি লইয়া তাঁহার ১১জন সংসার ত্যাগী সেবক তথায় থাকিয়া কঠোর সাধন ভজনের দ্বারা নিজেদের ইহলোকের গণাদিনগুলি কাটাইয়া দিতে থাকেন। উঁহাদের মধ্যে চার জন বিবাহ করেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামী অদ্বৈতানন্দ স্ত্রী কন্যা বিয়োগের পর শ্রীশ্রীদেবের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজদ্বয় মাতা পিতা এবং স্ত্রীর সঙ্গে সন্ন্যাস-

অন্তরঙ্গ সেবকগণের বরাহ-নগর প্রামাণিক ঘাট রোডে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ প্রতিষ্ঠা এবং তথায় সাধন-ভজন।

ধর্ম্মে আসিয়া আর কোনই সংস্রব রাখেন নাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ শিশুপুত্র এবং পত্নীর সংস্রব ত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দমোহন এবং বিমাতার পরম ভাগবত পিতৃদেব শ্যামলাল সেন মহাশয়ও তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের সে চেষ্টার ভাল ফল ফলে নাই। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদের পিতার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া স্পষ্টই বলেন, "আপনারা আর আমাদের গৃহে ফিরিয়া লইবার আশা ত্যাগ করুন। কেন বৃথা তজ্জন্য মঠে যাতায়াত করিতেছেন। আমরা আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না।"

ধন্য শ্রীশ্রীদেবের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে জীবনাহুতি! কামিনী ও কাঞ্চনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া তোমরা আমাদের কল্যাণ কল্পে যে উচ্চ জীবনাদর্শ রাখিয়া গিয়াছ—যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে থাকৃবে—'ওমনটি আর দেখা গেল না'।

১০

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র "উদ্বোধনে" (এক্ষণে মাসিক হইয়াছে) স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত "পরমহংসদেবের উপদেশ" ধারাবাহিক বাহির হইতে থাকে। বঙ্গাব্দ ১৩১১ সালের ১লা মাঘ স্বামীজি মহারাজের প্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া ঐ "পরমহংসদেবের উপদেশ"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ" সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ।

হইতে বাছিয়া ১১৪টি সাজাইয়া গুছাইয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ" পকেট সংস্করণ পুস্তকাকারে বাহির করেন। বর্ত্তমানে যে সংস্করণ আমরা দেখিতেছি, উহা তাহারই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসে উহারই দশম সংস্করণ বাহির হয়।

স্বামী শঙ্করানন্দ-প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান সংস্করণটি স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের বিশেষ উদ্যোগে মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত দেখা যায়। স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী না হইলে আমরা মহারাজজীর ঐ অমৃতময় গ্রন্থখানির নূতন কলেবর দেখিতে পাইতাম না। মঠের "ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিমন্দির" ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইতেছে। ১৩২৮-সালের ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার ঐস্থানে তাঁহার মানব শরীর দাহ করা হয়। ২৭শে চৈত্র, সোমবার রাত্র ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি বাগবাজারস্থ বলরাম-ভবনে থাকিয়া মহাযাত্রা করেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের প্রমুখাত আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে, তাঁহার ইষ্টদেবের ইঙ্গিতানুসারে ঐ স্থান মহারাজজীর শিষ্য সেবকগণের পক্ষে পরম পবিত্র।

শ্রীশ্রীদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় উচ্ছ্বাসগুলির প্রচার স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের মধ্য হইতে গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় সর্ব্বপ্রথম করেন। তাঁহার

গৃহীশিষ্য ও সেবকগণের মধ্য হইতে ঋষি সুরেশ চন্দ্র দত্ত, মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত, পরমভাগবত অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রভৃতি তারপর শ্রীশ্রীদেবের উপদেশ পুস্তকাকারে বাহির করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ" পুস্তকাকারে বাহির হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীদেবের গৃহী সেবক শিষ্য দ্বারা ঐ পথ প্রথম প্রশস্ত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থে অনেক তত্ত্ব চয়নও করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ" প্রচার-প্রসঙ্গ।

তাঁহার বরাবর প্রাণে সাধ ছিল যে, শ্রীশ্রীদেবের উপদেশ বিনামূল্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন ও মঠ তাঁহার ঐ সাধটি এ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার জন্য তিনি বহুবার অনুরোধও করেন।

প্রাণের সাধ।

বাগবাজার "লক্ষ্মীনিবাসের লক্ষ্মীমন্ত শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সহোদরদ্বয় উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের স্বর্গীয় লক্ষ্মীমন্ত সাধক পিতৃদেব লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে মহারাজজীর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশের" স্বতন্ত্র চারটি সংস্করণ করিয়া তাহা বিনামূল্যে পিতৃ-স্মরণার্থে বিতরণ করেন। "লক্ষ্মীনারায়ণ স্মৃতি"র সাত

লক্ষ্মীমন্ত ভ্রাতাদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার প্রথম ঐ সাধ পূর্ণ হয়। শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বঙ্গাব্দ ১৩১৬ হইতে ১৩২৩ সালের ফাল্গুন পর্য্যন্ত লক্ষ্মীমন্ত ভ্রাতাদ্বয় ঐ গ্রন্থখানি তত্ত্বপিপাসুগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজজীর কত যে শুভাশীষ পাইয়াছেন—এস্থানে সে সব তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যায় বলিয়া তাহা উপস্থিত করা হইল না। উক্ত সাধু ভ্রাতাদ্বয় শ্রীশ্রীদেব এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য সেবকগণের ঘরের ছেলের মধ্যে গণ্য হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট একজন ভক্তকবি ও সুলেখক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার "বন্দনা" ও "সাধনা" নামকগ্রন্থদ্বয় আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীশ্রীদেব এবং স্বামীজিমহারাজ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থদ্বয়ে অনেকতত্ত্ব তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার "বন্দনা"তে মহাপুরুষের মহাসমাধি নামে শ্রীশ্রীমহারাজজী সম্বন্ধে একটি সুন্দর শোকোচ্ছ্বাসও বাহির হইয়াছে।

১৫৮ নং অপার চিৎপুর রোড নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র পাল মহাশয় শ্রীশ্রীমহারাজজীর আদেশ-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত কৈলাস চন্দ্র পাল এবং পিতৃদেব তারা-চাঁদ পাল মহাশয়দ্বয়ের পুণ্যস্মৃতি স্মরণার্থে ১৩২০ সালের মাঘ মাসে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশে"র দুইহাজার গ্রন্থ ছাপাইয়া তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। "কৈলাস চন্দ্র স্মৃতি" ও "তারাচাঁদ

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র পাল এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পালের কথা।

স্মৃতি” প্রচার করিয়া শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু সকলের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু মধ্যে পরিচিত হন। ১৩২৪ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ অনুমান ৬০।৬২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাল। আমরা শ্রীযুক্ত বৈদ্যবাবুর সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিয়াছি যে, তিনিও শ্রীশ্রীদেবের এবং তাঁহার শিষ্য-সেবকগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন রহিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র পাল মহাশয়ের কথা।

বাগবাজার নবীন সরকার লেন-নিবাসী উদার হৃদয় শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণ-সেবক শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার স্থাপিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লৌহ-ভাণ্ডার” হইতে “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ” এগার শত ছাপাইয়া তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাঁহার কার্য্য বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে আরব্ধ হয়। শ্রীযুক্ত ভূষণ বাবু ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “শ্রীযুক্ত বাবু —মহাশয়কে, প্রতিদিন এক অধ্যায় পাঠ করিবেন, আশা করিয়া সাদরে অর্পিত হইল।”

দত্ত ভ্রাতাদ্বয় এবং স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র পাল মহাশয়ও তাঁহাদের প্রকাশিত শ্রীশ্রীমহারাজজীর “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশে”রও স্বতন্ত্র দুইটি মুখবন্ধ লিখিয়া তাহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এস্থানে তাহা আর উদ্ধৃত করা হইল না। তাহার সার মর্ম্ম হচ্চে ‘সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-কল্পে ইহা প্রদান করা হইল’

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশে"র "Words of the Master" (Selected Precepts of Sri Rama Krishna) নামক এক ইংরাজী অনুবাদও বাহির হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে তাহার চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয়। বর্ত্তমানে ঐ সংস্করণই চলিতেছে। আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী মহারাজ ঐ গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত পুণ্যময় উচ্ছ্বাসগুলি ইংরাজী ভাষায়ও কত যে সরল হইয়াছে—যাহার রসাস্বাদ সামান্য ইংরাজী জানা লোকেও তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইবেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজজী শুনিতে পাই নাকি তাহার ইংরাজী অনুবাদ অপর দুজনের সহযোগে করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ মহৎ কার্য্যটি করিয়াছেন—বলিতে কি তাঁহারা সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন পূজনীয় ব্যক্তির মধ্যে থাকিয়া আমাদের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে থাকুন। তাঁহাদের সকলের শ্রীচরণ কমলে আমাদের শত শত প্রণাম অর্পিত হইল।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশে"র ইংরাজী অনুবাদ।

৫ম বর্ষের "উদ্বোধনে" স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ 'গুরু' সম্বন্ধে এক অতি সুন্দর জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ লেখেন। তাহার ভাষা বড়ই প্রাঞ্জল। আমরা তাঁহার লিখিত ঐ প্রবন্ধের শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা —" * *

"উদ্বোধন" পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দ লিখিত "গুরু"।

কেহ কেহ বলেন, শিষ্য যে রকমই হউক না কেন, সদ্‌গুরু লাভ হইলে তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ বা বলেন, গুরু যেরূপই হউন না কেন, শিষ্যের বিশ্বাস ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এ দুটী কথাই আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। তবে বাস্তবিক পক্ষে জগতে এরূপ ঘটনা কদাচিৎ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গুরুশিষ্য উভয়েরই উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। দেখা যায়, একই মহাপুরুষের শিষ্যগণের ভিতর কত তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারেই হইয়া থাকে। শিষ্য যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়ী ও অধ্যবসায় সম্পন্ন হয়, তবে সে অতি সহজেই গুরুপোদিষ্ট তত্ত্ব সমুদয় আয়ত্ত করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেরূপ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কথা পড়া যায়, তাহাতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্যের যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিষ্যের শরীর মন প্রভৃতি এমন শিক্ষিত (Disciplined) হয় যে, সে একটি মানুষ হয়।

আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারে নাই বলিলেই হয়। অনেকে আবার এই গুরুভক্তিকে তুলিয়া দিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। যদি দেশ হইতে এই গুরুভক্তি উঠিয়া যায়, তবে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি অন্তর্হিত হইবে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার সমাজে রাজত্ব করিতে থাকিবে। গুরুকরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পার, কিন্তু একবার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, তাঁহার কথায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পার। অনেকে মনে করেন, গুরুর উপর এইরূপ নির্ভর করিলে আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে ও আমরা ক্রমশঃ জড়পিণ্ডে পরিণত হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। বাস্তবিক সদ্‌গুরু কখনও কাহারও মনের স্বাধীনতা

হরণ করেন না, বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায় আপনি দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, মনের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন। লোকে সামান্য একটু অর্থ কিম্বা দৈহিক কোন উপকার পাইয়া লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ হয়। তবে যাঁহার নিকট তুমি জীবনের সারতত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ পদার্থ লাভের সন্ধান ও তল্লাভে ক্রমাগত সহায়তা পাইয়াছ, তাঁহার নিকট সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে কেন এত অন্যায় মনে কর? হিন্দুর ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি আর নাই। হিন্দু যে দিন গুরুভক্তি ভুলিবে, সে দিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্যুর কথা স্মরণ কর। সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে সেই অপার বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনও ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তিসহায়ে হইবে, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার মহৎমহৎ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব। শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইব, তাহা নহে, দেশের জন্য, স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।"

১১

মহারাজজীর তিরোভাবে বেলুড়ের শ্রীশ্রীমঠে এবং বসিরহাট শিকড়া-কুলীনগ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

১৩২৯ সালের ৯ই বৈশাখ বেলুড়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মহারাজজীর স্মৃতি-স্মরণার্থে শ্রীশ্রীদেবের এক বিশেষ পূজাও ভোগাদি দিয়া প্রায় দুই সহস্র শিষ্য সেবক প্রসাদ পান। ঐ উৎসব অনুষ্ঠানটিতে তাঁহার সেবক-শিষ্য প্রায় সকলেই যোগদান করেন। "সন্তান" নামধেয় জনৈক ব্যক্তির বিরচিত "শ্রীচরণে অঞ্জলি" নামে একটি কবিতাও ছাপাইয়া তথায়

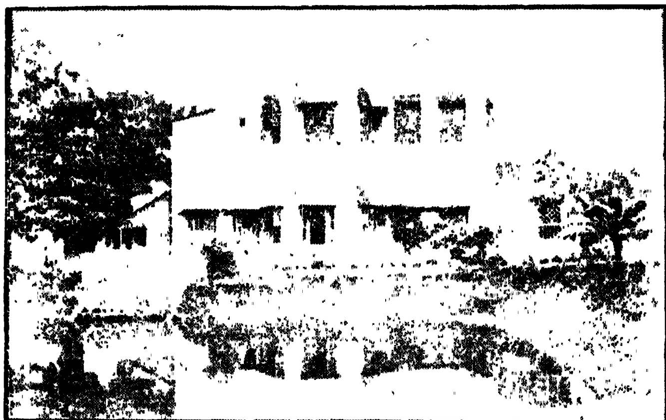
বিতরিত হয়। আমরা সকলে তাহা উপহার পাই। এখানে তাহার শেষাংশ উদ্ধৃত করা হইল। যথা,—

"* * *

* * *

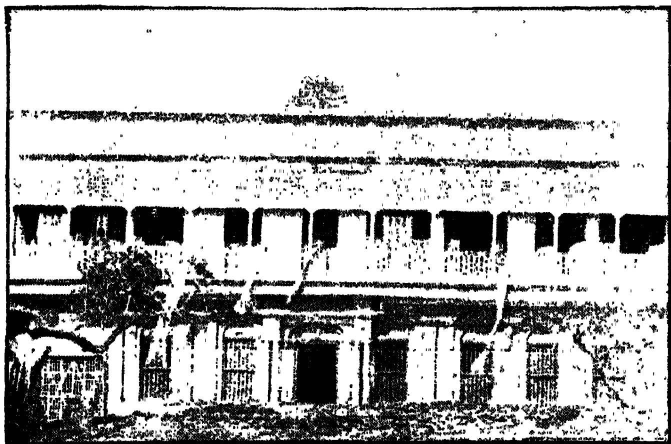
(হ'লে) "যোগনিদ্রা-গত," জয় "নারায়ণ,"
রাজিত অনন্ত শয়নে।
(থাক) নিত্য বিরাজিত, হৃদি মাঝে মম,
সতত জীবনে মরণে॥
(আমি) জয় জয় গানে, উরধ নয়নে,
করপুটি হৃদি গগনে ;—
দূর পরবাসে, কে রহিবে আর,
(এবার) চলেছি তোমার চরণে।"

তাঁহার স্মৃতি-স্মরণার্থে বসিরহাটে এক স্মৃতিসভা হয় ১৩২৯ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৫ই মে ১৯২২। "উদ্বোধন"পত্রের সহযোগী সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজের অগ্রজ মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত পশুপতি বাবু প্রধান উদ্যোগী হইয়া বসিরহাটে তাঁহার স্মৃতিসভা করেন। উহার একটি নিমন্ত্রণ পত্রও বাহির হয়। তাহাতে ঐ অঞ্চলের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়দ্বয়ের নাম স্বাক্ষর দেখা যায়। ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী শিকড়া-কুলীনগ্রামে শুভ পদার্পণ করিয়া মহারাজজীর জন্মস্থানটি দর্শন করেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার শিকড়া-কুলীনগ্রামে তাঁহার স্মৃতি



শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির ভবন—কাশীপুর বাগান

বলরাম বসু মহাশয়ের বাটী



শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজের মহাসমাধির ভবন।

ঐ অঞ্চলে জাগাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীদেবের পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থাও মহা সমারোহে করিয়া শিষ্য-সেবকগণের সেবা সুসম্পন্ন হয়। ঐ কার্য্যে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা,—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (দাদা মহাশয়), শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, (স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর সর্ব্বকনিষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতা), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, বি, এল (বালেশ্বরের উকীল ও মহারাজজীর মন্ত্রশিষ্য), শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ এম,এ (প্রফেসার), শ্রীযুক্ত বনবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ (মহারাজজীর বৈমাত্র মধ্যম ভ্রাতা), শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ ঘোষ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ। শিকড়া-কুলীন-গ্রামের রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ উৎসবে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী-সেবক শিষ্যের অনেকেই যোগদান করেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণও তথায় যোগদান করিয়া সকলকে আনন্দবর্দ্ধন করেন। তাঁহাদের নাম—বসিরহাটের স্বনামধন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কবিবর শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী বি, এ, বি, এল (ভূত-পূর্ব্ব "পল্লীবাণী"র সম্পাদক), শ্রীযুক্ত দুর্ল্লভচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, বি, এল, বক্তা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আড়বালিয়া), শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি। শিকড়া-কুলীনগ্রামের রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ উৎসব

অনুষ্ঠানে পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত একটি কবিতা এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "শোকোচ্ছ্বাস" পাঠ হয়! এখানে আমরা তারক বাবুর রচনার শেষাংশও উদ্ধৃত করিলাম। তাহা এইরূপ যথা,—

"* * * *
* * * *

যেমতি জনম লভি সিদ্ধার্থ প্রধান,
শুদ্ধোধন রাজ বংশে কপিলবাস্তুতে;
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বাক্য প্রচারিতে
তেয়াগিলা গোপা, প্রিয় তনয় রতন।
রাজ অট্টালিকা ছাড়ি গভীর নিশিতে
বাহির হইল বুদ্ধ চিন্তাকুল মন,
জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ দিতে বিসর্জ্জন
অক্ষয় উজ্জ্বল কীর্ত্তি আছে সারনাথে।
তেমতি ভাবিয়া এই অনিত্য সংসার
বিপুল বিভব ছাড়ি যৌবন সময়ে
প্রাণ-প্রিয়া পরিহরি ত্যজিয়া তনয়ে,
রামকৃষ্ণ পদাশ্রয় ক'রে ছিলে সার।
রামকৃষ্ণ পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম।
অবতীর্ণ অবতার রূপে মহীতলে॥"

ভ্রম-সংশোধন ও অতিরিক্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ।

"ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি"র তৃতীয় পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীমহারাজজীর প্রপিতামহের নাম মনোহর ঘোষ বলা হইয়াছে। মনোহর ঘোষ তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম। তাঁহার প্রপিতামহের নাম কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি বঙ্গের 'লক্ষ্মীমন্ত' পুরুষদিগের অন্যতম। তাঁহার পাঁচপুত্র। ১। শম্ভুচন্দ্র ২। হরিশ্চন্দ্র। ৩। উমেশচন্দ্র। ৪। মধুসূদন ৫। গোবিন্দ চন্দ্র। মনোহর ঘোষের পৌত্রগণ ঐ অঞ্চলে 'পাঁচবাড়ী'তে বিভক্ত দেখা যায়। যথা—'বড়বাড়ী', 'মেজবাড়ী', 'সেজবাড়ী', 'ন বাড়ী', 'ছোটবাড়ী'। ব্রহ্মানন্দ স্বামী 'মেজবাড়ী'র সন্তান। তাঁহার তিনজন বৈমাত্র ভ্রাতা আছেন। বিমাতা এখনও জীবিতা রহিয়াছেন। স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বাবু মহানগর কলিকাতা কাঁসারী পাড়া বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ পরম ভাগবত স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। স্বর্গীয় সেনজা এবং তাঁহার বাড়ীর সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বহুবার সন্দর্শন করিয়াছেন। সে সব তত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণে প্রদত্ত হইবে। তাহাতে মহারাজজীর অনেক কথা আছে। ১২৯৮ সালের ৭ই মাঘ সেনজার মহাযাত্রা হয়। তাঁহার ভবনে মহারাজ ৭।৮ বৎসর অবস্থান করেন। ঐ ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরও কয়েকবার যান। ঐ বাড়ীর নম্বর ৫৪।

'সেজবাড়ী'র শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ মহাশয় মহারাজজীর সমবয়স্ক বাল্যসখা 'পদদা' এবং তাঁহার আরো কয়জন সমবয়স্ক এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এ দীন কিঙ্করও পরিচিত হইয়াছে। পূজনীয় 'পদদা'র তৃতীয় সহোদর বালেশ্বরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল পূজনীয় ভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় এবং তাঁহার ভক্তিমতী বিদুষী পত্নী স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা এবং শ্রীশ্রীদেবের নামসুধা পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

মহারাজজীর গৃহী ও ত্যাগী সেবক শিষ্য—

শ্রীশ্রীমহারাজজীর সংসার বিরাগী ত্যাগী সেবক ও শিষ্যের সংখ্যা ১১৫ জন। তাঁহার গৃহী সেবক ও শিষ্য অনেক। তাঁহাদের সংখ্যা এবং নাম দ্বিতীয় সংস্করণে দিব। ৯৮।২ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী মহারাজজীর নিকট সর্ব্বশেষ শ্রীশ্রীদেবের নামসুধা পান। [৩০।১১।১৩২৯—ইংরাজী ১৪ মার্চ্চ বুধবার ১৯২৩।] ঐ সনের শ্রীশ্রীদেবের জন্মতিথি পূজার দিন তিনি তিনজনকে সন্ন্যাস দেন। বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক স্বামী অর্পণানন্দ মহারাজ ঐ তিনজনের অন্যতম। এখন হইতে ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে বাগবাজার নিবাসী বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার ও শৈলেশ্বর বসু বন্ধুদ্বয় তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীদেবের নামসুধা পান। তাহার পর বহুবাজার ১০নং মদন বড়াল ষ্ট্রীটস্থ আমাদের পরম পূজনীয় ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দে মহাশয় তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীদেবের নামসুধা পান। তখন বিনোদ বাবুর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর। মহারাজজীর গৃহীভক্তদিগের মধ্যে ইনি চিরকুমার ব্রহ্মচারী। আমরা অবগত আছি যে,—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজী মানব শরীর ছাড়িবার পূর্ব্বেও অর্থাৎ সোমবার ২৭শে চৈত্র ভোর ৫টার সময় বলিয়াছিলেন—"আমার বিনোদ কোথায়?" "আমার বিনোদ কোথায়?" তারপর তিনি আর কথা কহিতে পারেন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী রবিবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, নারাণ, আয়েঙ্গার মান্দ্রাজী ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামলাল দাদা প্রভৃতি বিনোদ বাবুর বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিয়া শ্রীশ্রীদেবের উৎসবানন্দে সকলকে মাতাইয়া তুলেন। কলিকাতা অঞ্চলের প্রায় তিনশত ভক্ত-শিষ্যও ঐ উৎসব-অনুষ্ঠানে

যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদেবের শিষ্য ও সেবকগণের সঙ্গে ভাবে মাতোয়ারা হইতে তাহার পর আর আমরা তাঁহাকে (মহারাজজীকে) দেখি নাই। বিনোদ বাবুর বাড়ীর সকলের প্রতি তাঁহার অশেষ কৃপা। ধন্য বিনোদ বাবু এ অধমাধম কিঙ্কর কি তোমার চরণরেণু পাইবে না ?

কলিকাতা কাঁসারী পাড়া নিবাসী বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় [মহারাজজীর 'খগেন মামা'] এবং তাঁহার ভক্তিমতী অতি বৃদ্ধা জননীদেবী আমাদিগকে তাঁহার জীবনস্মৃতির অনেক তত্ত্ব দিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে সেই সব তত্ত্বকথা দিতে পারা গেল না। ভবিষ্যতে তাহা যাইবে।

বরাহনগর বাগানে (অর্থাৎ পরম ভাগবত ৺মণিলাল মল্লিক মহাশয়ের বাগানে) বঙ্গাব্দ ১৩২১ সালের ১০ই মাঘ একটি শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণোৎসব মহাসমারোহে হয়। উহাতে মহারাজজী প্রভৃতি সকলেই যোগদান করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হন। শ্রীশ্রীমারও শুভাগমন হয়। সে সব তত্ত্বসুধাও এবার যাইল না। পরে তাহা যাইবে। স্বর্গীয় মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রীদেবের একজন বিশেষ স্নেহভাজন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কলিকাতা-ভবনে বার কয়েক শ্রীশ্রীদেবও যান। তাঁহার বসত ভবনটি 'সিন্দুরিয়া পটীর ব্রাহ্মসমাজ' নামে বিখ্যাত। বর্ত্তমানে ঐ পবিত্র ভবনটি চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর কিছুদিন পরে তাহার কোনই চিহ্ন থাকিবে না। কলিকাতা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী তাহা একরকম গ্রাস করিয়া লইয়াছেন। আমাদের পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী নন্দিনী ও শ্রীমতী আমোদিনী দেবীদ্বয় স্বর্গীয়

মল্লিক মহাশয়ের কন্যা। শ্রীমতী নন্দিনী দেবী শ্রীশ্রীদেবের একজন বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত স্ত্রীভক্ত। তাঁহার উচ্চ জীবনাদর্শে এখন অনেকেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজজী ইঁহার সম্বন্ধে এক সময় বলেন,—"আমাদের নন্দিনীদিদির পবিত্র সঙ্গে যাঁহারা আসিবেন—কালে তাঁহারাও এক একজন আদর্শনারী হইয়া যাইবেন।"

শ্রীশ্রীদেবের গৃহীভক্তদিগের অন্যতম ৺ নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভক্তিমতী পত্নী এবং পুত্রগণ শ্রীশ্রীমহারাজজীর স্মৃতিমন্দির বহু অর্থব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। বেলুড়ের শ্রীশ্রীগুরুপীঠে ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এই সনের তাঁহার জন্মতিথিতে হইবে। স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ইনি মহারাজজীর সন্ন্যাসী শিষ্য সেবকগণের অন্যতম। স্বর্গীয় ঘোষজার এক পুত্রও মহারাজজীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। নবগোপাল বাবুর হাওড়া রামকৃষ্ণপুরস্থ ভবনে মহারাজজী মধ্যে মধ্যে অবস্থানও করিতেন। শুনিতে পাই এই বাড়ীর সকলের স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইষ্টদেব ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজজীর পুণ্য জন্মভূমি শিকড়া—কুলীনগ্রামে তাঁহার স্মৃতি ঐ অঞ্চলে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কেহ কি তথায় "ব্রহ্মানন্দ-মন্দির" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইবেন না? বসিরহাটবাসী সকলে ঐ বিশেষ বিষয়টির জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। আপনাদের দেশের সুসন্তানের স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে প্রথমে আপনারা উদ্যোগী না হইলে কেমন করিয়া তাহা ত্বরায় প্রতিষ্ঠা হয় বলুন?

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীশ্রীমহারাজজীর যাবতীয় ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্য সেবকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তাঁহার যাবতীয়

গৃহস্থ ভক্ত শিষ্যের নাম ও ঠিকানা, তাঁহাদের তাঁহার নিকট কৃপাকণা পাইবার তত্ত্বকথাও লিপিবদ্ধ করিবার এ দীন কিঙ্করের সাধ রহিল। তাঁহার নিকট কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য সেবকগণ এবং পরম ভক্তিমতী মা সকল কি এ দীন লেখককে তাঁহাদের কৃপার বিবরণাদি দিবেন না? সকলের সকল কথা তাঁহারা না লিখিয়া পাঠাইলে এ দীন কিঙ্করও সেই সব তত্ত্ব কেমন করিয়া সংগ্রহ করে বলুন?

সর্ব্ব-ধর্ম্মের মিলন নিকেতন কলিকাতাস্থ বিখ্যাত দেবালয় এসোসিয়সনের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মর্ষি শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমাদের শ্রদ্ধেয় কবিবন্ধু শ্রীযুক্তব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত "শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মরণার্থে" নামে যে একটি সুন্দর কবিতা এই "ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি"র জন্য রচনা করিয়া আমাদিগকে দেন,—বলা বাহুল্য তাহা পাঠে পরম ভাগবত ব্রহ্মর্ষি মহাশয় মুগ্ধ হইয়া যান। দেবালয় এসোসিয়সনের একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র আছে। আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহোদয় "The Devalaya Review"র সম্পাদক। সতীন্দ্র বাবুও ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত বাঙ্গালা কবিতাটির সুখ্যাতি করেন। উহার একটি ইংরাজী অনুবাদের জন্য তিনি আমাদিগকে বলেন। আমরা কবিবন্ধুকে তাহা বলাতে তিনি তখনই তাহার একটি ইংরাজীও করিয়া দেন। তাঁহার ঐ ইংরাজী রচনাটি আমরা দেবালয় রিভিউ'র VOL. VI. No. 5. May, 1923 তে বাহির করি। শ্রীশ্রীমহারাজজীর শিষ্য সেবকগণকে ঐ মধুমাখা ইংরাজী কবিতাটিও উপহার দিলাম। আমাদের কবিবন্ধু ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যাহা যাহা লিখিয়াছেন—বলিতে কি তাহার সকলগুলিই উপাদেয়।

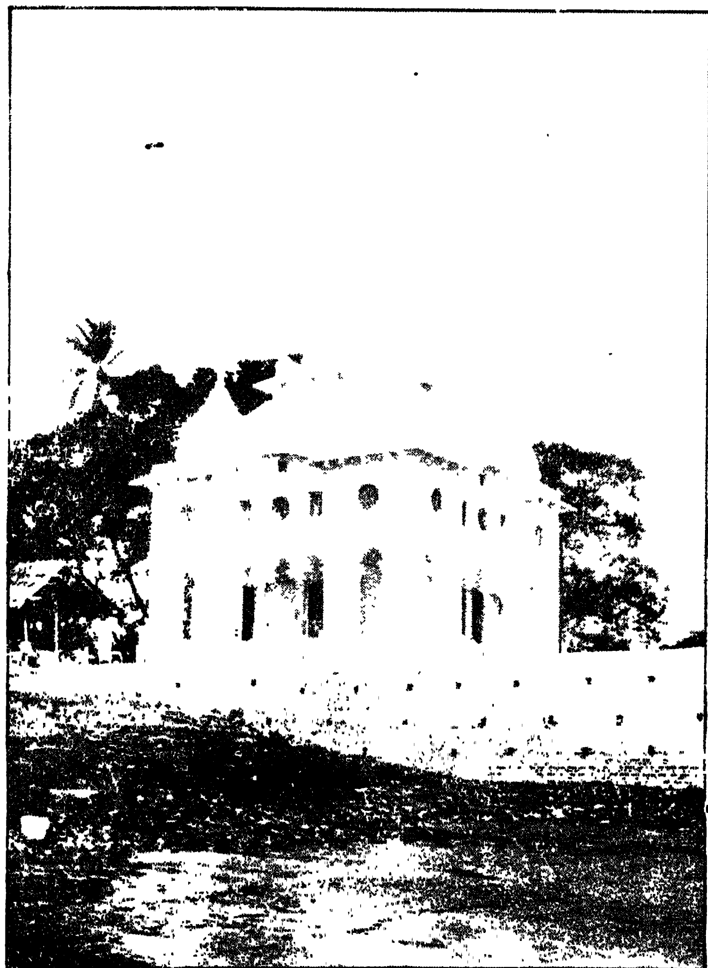
In Memoriam : Swami Brahmananda.

[By Mr. Brojendra Krishna Ghose.]

A wife beloved, and a son,
Thy heart's delight, wise anchorite !
Thou didst renounce when youth to run
Its course began, and, by this bright
Renunciation, truly great,
Show to the world thy excellence,
Like prince Siddhartha incarnate,
By potent psychic power intense
Drawn to the feet of him, renowned
For saintship high, as will-born son,
To help the needy sick or sound,
On chance of death or vict'ry won,
Didst thou resolve on. For redress
Of human suffering and care,
O Hermit-errant in all place
Of Bharat didst thou roofs uprear
All aid to render, and thy fame,
Like monumental column high,
Establish thus, on Hindu name
Shedding a radiant light thereby—
Clad in loin-cloth and all alone !
By practice of austerity,
In dark Himalayan caves unknown,
Truth, knowledge and Felicity,
The three-fold primal attribute
Of God supreme, didst thou attain.

Achievement rare ! And thy repute,
Worldly Rakhal ! will e'er remain
As Brahmananda, blest of Hea'vn.
Vivekananda's foot-prints bold
Didst thou pursue, his banner ev'n
Flying aloft in glory hold,
That had triumphant set an age,
Truly philanthropic indeed !
Thy foot-marks in their varied stage
To vict'ry sure may others lead !

ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি।



"সখা হে আমার লাগি কেঁদনা বৃথায়।
মরি নাই আমি বন্ধু, নিদ্রিত হেথায়॥"

ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি

পরিশিষ্ট।

জীবনের নানা কথা।

—:*:—

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানস-পুত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের অধ্যক্ষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী গতকল্য সোমবার রাত্রি ৮টা ৫৫মিনিটের সময় মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জননী জন্মভূমির ছিন্নাঞ্চল প্রান্ত হইতে আজ যে কি উজ্জ্বল নীলমণিটী খসিয়া পড়িল,—স্থূলবুদ্ধি প্রাকৃতজন আমরা, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সিদ্ধ-সাধক-জীবন লইয়া দেশের যে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ ছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা শোক-তাপ ক্লিষ্ট হৃদয় লইয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে ক্ষণকাল বসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে এই মহাপুরুষ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা! আমার বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপর,' আজ পর্য্যন্তও এই কথাটুকুর ইতি করিতে পারিলাম না, ধর্ম্মতত্ত্ব বেশী শুনিয়া কি করিবে বাপু!" এই তত্ত্ব তিনি সাধন করিয়া ছিলেন, এই সাধনায় তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। সিদ্ধিলাভ করিবার পর বহুবর্ষ যাবৎ লোকহিতরূপ পরমশ্রেয় সাধন করিয়া আজ তিনি

আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসৃত হইলেন! আমরা সংসারী স্বার্থপর লোক, কতভাবে ব্যক্তিগত দুঃখ দৈন্যের কথা তুলিয়া তাঁহার চিত্তের ব্রহ্ম-বিহারে বাধা উৎপাদন করিয়াছি, আজ হইতে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবেন। হে আত্মারাম্ পুরুষ, তোমার চরিত্র, তোমার সাধনা, তোমার জীবনের মধ্যে ভারতের যে সনাতন সত্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, এই অধঃপতনের যুগে, এই জড়বাদ সর্ব্বস্বযুগে ভারতবর্ষ তাহার আত্মা, তাহার সাধনা হারায় নাই। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সংসার-সাগরে, বিপদের ঘনান্ধকারে তোমার তপোজ্জ্বল জীবনখানি, আলোকস্তম্ভের মত দেদীপ্যমান থাকিয়া কত পথভ্রান্ত পথিকের জীবন তরীর গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে, কত হতভাগ্যকে ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে, সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া আজ তোমার মহাযাত্রায় আমরা ব্যথিতচিত্তে, অনাথ হইলাম ভাবিয়া ম্রিয়মান হইতেছি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে চৈত্র, মঙ্গলবার, সন ১৩২৮ সাল।

সৌম্য, শান্ত-দর্শন, স্থিরধী, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তিনি সভাপতি ছিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য তিনি আত্ম-প্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, সেবা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আতুর-ব্যথিতের নিকট দণ্ডায়মান। 'জীবে দয়া' তিনি বলিতেন না—তিনি বলিতেন 'জীবসেবা'। এই সেবা-ধর্ম্মকে ভারতে সুপ্রতিষ্টিত করিবার জন্য ব্রহ্মচারী আপনার উচ্চ সাধনমার্গ হইতে নামিয়া, আপনার নিভৃত গুহা হইতে বাহির হইয়া, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরিতে

হইয়াছে। শুধু ইহাদের সেবা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই;—তিনি এই সকল নারায়ণের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে কেবলমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই;—তিনি দেখিয়াছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে যাহাতে তাঁহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে—মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত মানবত্বে—ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু ভারতে কেন, ভারতের বাহিরেও হিন্দুধর্ম্ম প্রচার-কল্পে,হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা এক্ষণে সর্ব্বজনবিদিত। এ সকল চেষ্টার মূলেও আমরা স্বামীজির অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিতে পাই। এই প্রতিষ্ঠান-বটবৃক্ষ-মূলে তিনি আজীবন জলসেচন করিয়াছেন। এই নীরব কর্ম্মীর সাধনা কখন বিফল হইতে পারে না। এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার যুবকবৃন্দ দেশের ও দশের কাজে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করুন, ইহাই আমাদের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা।

তাঁহার অভাব আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। বাঙ্গালা দেশ একজন প্রকৃত কর্ম্মীকে হারাইয়া ব্যথিত। কিন্তু তাঁহার পুণ্যাদর্শে যে নূতন কর্ম্মী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে, আশা করি. তাঁহাদের মধ্যে সকলেই, অন্ততঃ কেহ না কেহ অগ্রসর হইয়া, তাঁহার অভাব মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।—ভারতবর্ষ, ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড —৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। পৃষ্ঠা ৯৩৬।

রামকৃষ্ণ-'ববেকানন্দ মিশনের মহামনা সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে মিশন ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেনই, দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও গরীব দুঃখী বিপন্নের মা-বাপ সুতরাং অতি বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু ভাব-

বিলাসী ছিলেন না। * তিনি হিসাবী ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি সুশৃঙ্খল ছিল বলিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন ঝড় ভূমিকম্পাদিতে বিপন্ন অগণিত লোকের সাহায্য করিতে পারিতেন। —প্রবাসী, ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

নিশীথ সময়ে নগরবাসী যখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন যেমন নগর-রক্ষক, সদলবলে, আলোক হস্তে নগর রক্ষা করিতে বাহির হন; তদ্রূপ, যখন তমোরজনী আসিয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, ভগবদ্-বিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান বিস্মৃত মানব যখন ইন্দ্রিয়-সুখসর্ব্বস্ব হইয়া মায়ার ক্রোড়ে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন হয়, তখন ভগবান সদলবলে জ্ঞানালোক হস্তে এই পৃথিবীতে আসিয়া, "ওগো জাগো, গভীরা রজনী, চারিদিকে তস্কর, গুপ্তধন রক্ষা কর" বলিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফেরেন।

কত আশার কথা! কত ভরসার কথা! রোগজীর্ণ, অনাহারশীর্ণ ভারতবাসীর পুরাতন ভগ্ন কুটীর দ্বারে এই প্রকার কতবার ভগবানের আবির্ভাব হইল! শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শঙ্কর, মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি কতজন ভারতবাসীর মায়ানিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিতে কত কষ্ট স্বীকার করিলেন। সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করিয়া, কত রৌদ্র বৃষ্টি মাথার উপর সহিয়া, অসহায় পথশ্রান্তি তুচ্ছ করিয়া বিষয়সুখ পদদলিত করিয়া ভিখারির বেশে ভারতের দ্বারে দ্বারে কত ফিরিলেন।

* বিলাসের ক্রোড়ে লালিত ব্রাহ্ম ভায়ারা ভাবেরও বিলাসী। তাঁহাদের সম্প্রদায় সীমার বাহিরে অপর কোন সম্প্রদায়ের কেহ ভাববিলাসী হইতে পারে ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। সাধু-সন্ন্যাসীরা বিলাসের ধার ধারেন না। তবে, অত বড় একজন মহাচেতা সাধক ভাবপ্রবণ ছিলেন না বলিলে উপহাসের কথা হয়।—শ্রী সত্যচরণ মিত্র। ৫। ১১। ২৯।

ভারতের বড় সৌভাগ্য যে, পুনঃ পুনঃ ভগবৎ প্রেমোন্মত্তগণের হরিধ্বনিতে তার পল্লীপথ সমূহ মুখরিত হইতেছে—তার কর্ণকুহর পবিত্র হইতেছে। কৈ এত দেশ মহাদেশ ত রহিয়াছে কোথাও ত আর এইরূপ ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব মহাপুরুষগণের আবির্ভাব এত হয় না! মহম্মদ ও যীশু ভিন্নদেশে আসিয়াছিলেন, তাও নাকি যীশু এই ভারতেই ভগবৎতত্ত্ব শিক্ষা ও সাধনা করিয়াছিলেন শুনিতে পাই।

বার বার অবতারগণের অবির্ভাবে ভারত এমন একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিল যাহা আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশবাসী করে নাই, ভারত অবতার দেখিলে চিনিতে শিখিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা যাহা-তাহা বলিয়া মুগ্ধ করিতে ভারতকে আর কেহ এখন পারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক তত্ত্ব জানিতে হইলে পৃথিবীর যাবতীয় অধিবাসিগণকে এখন ভারতের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

বড় কম ব্যাপারটা কি হইয়া গেল! এই ৮ ৯ শত বৎসরের ভিতর শঙ্কর মহাপ্রভু ও তাঁর সহচরগণ, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, নানক, কবির, রুহিদাস, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিজয়গোস্বামী, বামাক্ষেপা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সহচরগণ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেন! বাংলার কথা বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রায় একই সঙ্গে, রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ যে বাংলায় জন্মগ্রহণ করিলেন, সে বাংলায় আর কি কুসংস্কার সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে! বাংলায় এবার আগুন লাগিয়াছে, সে আগুনে বাঙ্গালী পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটি হইতেছে। বাংলার চতুর্দ্দিকে জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলা পূর্ণ জাগরিত হইবে। প্রীতি, মনুষ্যত্ব ও ভ্রাতৃ-ভাব বাংলার লক্ষ্মীশ্রী পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া দিবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনী-

আলোচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাঁর উন্নত চরিত্র, সর্ব্বজনীন ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ ও উদারতা তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক ও ভারতবাসীর একটি চিরগৌরবের সামগ্রী। যাঁহারা তাঁর পুণ্য সংস্পর্শে অর্দ্ধ দণ্ডের জন্যও থাকিয়াছেন, তাঁহাদের ত্রিতাপ দগ্ধ হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণেও সান্ত্বনালাভ হইয়াছে। তাঁহার শ্রীমুখউচ্চারিত একটী কথা হৃদয়ে কত শান্তি ঢালিয়া দিত। পাপী, পুণ্যবান, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ যখন যিনি যে ভাব লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছেন তিনি তখনই সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত সেই থাকের কথা কহিতেন। কেহ তাঁর সহিত কথা কহিলে, কে কোন্‌কথাটি—কোন্ ভাব লইয়া বলিল, তাহা তৎক্ষণাৎ ঠিক ঠিক ধরিয়া তাহাকে সেই থাকের উত্তর দেওয়া, আমরা তাঁহার পুণ্য জীবনে একটি আশ্চর্য্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। উচ্চ বা অধম সকলের মনের সহিত নিজের মন মেলান—সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও সম্ভব নহে। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ঘোর বিষয়ী, বৈষ্ণব, শাক্ত, তত্ত্বদর্শী সন্ন্যাসী বা স্ত্রীলোক যাহার সহিত যখন তাঁহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বিশেষজ্ঞের মত সেই বিষয়ে কথা বলিতেন। সুধামাখা শান্তিপূর্ণ বাক্যগুলি যেন দেখাইয়া দিত হৃদয়ে তাঁর কত শান্তি, কত সুধা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শ্রোতা নির্ণিমেষ লোচনে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃপূর্ণ চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাঁর কথা শুনিতেছেন। একটিও কথা তাঁর মুখ হইতে খাপ ছাড়া ভাবে বাহির হইতে শুনি নাই।

একবার হঠাৎ আমরা উপরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি অনেকগুলি ভদ্রমহিলার সহিত কথা কহিতেছেন। আমরা পার্শ্বের ঘর হইতে ২।১টি তাঁর কথা শুনিয়াই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গৃহস্থ ঘরের বধূদিগের অন্তরের কথা সমূহ,—তিনি সর্ব্বত্যাগী সাধু হইয়া কিরূপে জানিলেন? মহিলা ভদ্রগণকে এরূপ তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদের গার্হস্থ্য

নারী-জীবনের ত্রুটি ও দোষ সকল ধরিয়া দিয়া তাহা কিরূপে সংশোধন করিতে হয় উপদেশ করিতেছেন। তাহা আমাদিগকে যুগপৎ ঘোর বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ করিল ও সেই সময় এমন কতকগুলি নূতন কথা শুনিলাম যাহা আমরা আর কোন দিনও শুনি নাই।

সুদীর্ঘকাল জীবনের আদর্শকে অধিকারচিত্তে ধরিয়া থাকা মহাপুরুষের লক্ষণ, ইহা তাঁহার জীবনে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। তিনি যে কায়ক্লেশে কোনও প্রকারে ভগবৎ পথে বিচরণ করিতেছিলেন তাহা নহে, তাঁহার ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪১ বৎসর তিনি সহাস্য বদনে অতি সহজভাবে পরম সত্য উপলব্ধি করিতে ছিলেন এবং যাঁহারা তাঁর সংসর্গে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বিনা ক্লেশে আরো অগ্রসর হইতে শক্তি দিয়াছিলেন।

পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ যে শিশু রামকৃষ্ণ মিসনকে—তাঁর হস্তে অর্পণ করিয়া যান তার যথার্থ উন্নতি এবং সার্ব্বাঙ্গিক সুশৃঙ্খলা বিস্তার করিয়া তিনি কিরূপ তাহাকে পরিপুষ্ট ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলেন তাহা ভাবিলে যথার্থই চমৎকৃত হইতে হয়। লোকাভাব এবং অর্থাভাবের মধ্যে সারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে চিরস্থায়ী পরোপকারের কেন্দ্র সকল স্থাপন করা ও সুচারুরূপে তার পরিচালনার বন্দোবস্ত করা কি ক্ষুদ্র বুদ্ধির কার্য্য? ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখে সমস্ত দেশবাসীর জন্য অন্ন বস্ত্রাদি লইয়া ধরা একজন কৌপিন সম্বল সন্ন্যাসীর পক্ষে কতটা মানসিক বলের পরিচায়ক তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যাঁহারা অন্ততঃ একটি পল্লীকে অন্নদান করিয়াছেন। দেশব্যাপি মহামারির সম্মুখে সমস্ত দেশবাসীর জন্য ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা কতটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যাঁহারা অন্ততঃ একটি পল্লীতে তদ্রূপ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ভীষণ জলপ্লাবনের সময় অন্যের

প্রাণ রক্ষার জন্য, কে কবে কোথায় নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে? শ্রীরামকৃষ্ণ মিসন আশৈশব তাহা করিতে অভ্যস্ত এবং তার সুযোগ্য কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ!

একটি চাকা একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে ঘোরান অতি সহজ; কিন্তু প্রথম পাকটি ঘুরাইতে কত খানি শক্তির প্রয়োজন? আজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দেশের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে, দশের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রথমে ইহাকে কে যত্ন করিত; কয়জন ইহার জন্য শক্তি ক্ষয় করিতে প্রস্তুত ছিল?

বৌদ্ধ যুগের বিরাট বৌদ্ধ সঙ্ঘের (organisation) কথা ইতিহাসে দেখিতে পাই। তত বড় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ ভারতে আর দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেই বিরাট চৈত্ত বা বিহার সকল হইতে সঙ্ঘ বদ্ধ বৌদ্ধেরা কিরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত ভারতের যাবতীয় প্রদেশকে ও গ্রীস্ হইতে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ সমূহে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন তাহা যৎপরোনাস্তি বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই বিপুল ধর্ম্ম সঙ্ঘের বিধি (Rules and regulations) এতই প্রখর ছিল যে সঙ্ঘের নেতার আজ্ঞা মাত্র ভিক্ষু গণকে অত্যাবশ্যকীয় পূজা ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইত, ভারতের সেই গৌরবের দিন অস্তমিত হইয়াছে। সে পূর্ব্বস্মৃতি এখন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। পূজনীয় শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কৃপায় বর্ত্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে দেখিয়া আমরা বৌদ্ধ যুগের সেই বিরাট ধর্ম্ম সঙ্ঘকে ধারণা করিতে পারি।

ব্রহ্মচর্য্য পালন, বেদ অধ্যয়ন ও ঈশ্বর লাভ ভারতের নিজস্ব সামগ্রী হইলেও বর্ত্তমানে তাহা লুপ্ত! দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী করিয়া প্রাচীন ভারতের চির গৌরবের শম, দম তিতিক্ষাদি পূর্ণ ঋষি জীবনের

পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বঙ্গের তথা সারা ভারতের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

তুমি আজীবন মুখ বুঝিয়া দেশের সেবা করিতে চাও, এস রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান কর, তুমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর উপলব্ধি করিতে অভিলাষী, এস রামকৃষ্ণ মিশনের শরণাপন্ন হও! এত বড় মহা সুযোগ সারা ভারতের তথা জগতের জন্য উন্মুক্ত করিয়া সত্যই পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ আজ জগতের পূজ্য হইয়াছেন এবং তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া ও তাঁহাদিগের দেশ বিদেশের কীর্ত্তি সকল বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বলিয়া সারা বাংলার গর্ব্বের সামগ্রী।

পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে কেবল শারীরিক পরিশ্রমের স্থান করিয়া যান নাই। প্রকৃত মানুষ তৈরি তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের ভিতর কি পরিমাণে হইত তাহা পরিদর্শন করা ও তৎবিষয়ে আরো উন্নতি সাধন করা পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ছিল। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, সন্ধ্যাহ্নিক, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের নিয়ম াদি পালন মঠস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ কতদূর করিতেছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করিয়া কেহ কোন বিষয়ে অপারক হইলে তাহাকে সুমিষ্ট কথায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া তাঁর দৈনিক কার্য্য ছিল।

বহুজনের প্রভু হইলেও তিনি এতই নিরভিমান ছিলেন যে একটি বালকও তাঁহার সহিত মনের আনন্দে মেলামেশা করিতে পারিত। প্রভুত ক্ষমতাবান হইলেও তিনি কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন না। সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া এক একটি কার্য্য করিতেন। এমন কি তাঁহার বেতন ভোগী চাকরকেও তিনি কখনও "হুকুম" করিতেন

না। কোন বিষয়ে বলিতে হইলে বন্ধুভাবে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিতেন যথা, "হাঁহে, কুটনোর খোসাগুলা গঙ্গায় ফেলে না দিয়ে, গরুকে দিলে হয় না!" ইত্যাদি। কবি গাহিয়াছেন—

"বজ্রাদপি কঠোরানি
মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কোহনু বিজ্ঞাতু মর্হতি॥"

তাহা তাঁহার জীবনে আমরা প্রতিক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি সত্যের জলন্ত সূর্য্য স্বরূপ থাকিলেও হৃদয় তাঁহার কুসুমাদপি কোমল ছিল। একবার কোন একটি বালক কোন একটি গৃহস্থ বাড়ির মূল্যবান দেওয়ালগীর অসাবধানতায় ভাঙ্গিয়া ফেলে, তিনি তাহা শুনিয়া, বালকটিকে ডাকিয়া পাঠান। বালকটি ভয়ে জড় সড় হইয়া তাঁর নিকট থাকিয়া হেঁট মুণ্ডে দণ্ডায়মান হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করে ভাংলি?" বালকের তখন উত্তর দিবার শক্তি ছিল না। তিনি পুনরায় বলিলেন "জানিস্ পরের বাড়ি ভাংলে দাম দিতে হয়, আর যাস্ নে!" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ একটি লোককে টাকা দিয়া ঐ প্রকার একটি দেওয়ালগীর কিনিয়া আনিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন।

তিনি বহুদূরে অবস্থান করিলেও সকলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি অন্তরের সহিত পালন করিতেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ে তিনি এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্রেক করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ও মহাবীরের কোনও বিশেষ পূজা বাংলায় নাই, তাই তিনি প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও রামনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের নাম সংকীর্ত্তন ও মহাবীরের পূজা অর্চ্চনা মঠে ও মঠের শাখা সমূহে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ভক্তগণ ভারতের সর্ব্বস্থানের

আশ্রম সমূহে উক্ত তিথি সকলে রামনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে।

জাগতিক যাবতীয় বিষয়েও তাঁহাকে অত্যন্ত পারদর্শী দেখিয়াছি। জাগতিক যাবতীয় বিষয়ে এবং সকল প্রকার লোকের মনে সান্ত্বনা দিবার অমূল্য উপদেশ দিবার ক্ষমতা তাঁহার অত্যন্ত ছিল। গৃহে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ সময়ে অভিজ্ঞ ইন্‌জিনিয়ারগণও জটিল বিষয় সমূহে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় মনে করিতেন। মকদ্দমা পরিচালনা ও আইন কানুন এত সুন্দর ভাবে বুঝিতেন যে উকীল ব্যারিষ্টার এটর্ণি-গণও তাঁহার তীক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্য লইবার জন্য উৎগ্রীব হইতেন। সংগীতের সকল রাগরাগিণী এরূপ সুন্দর ভাবে বুঝিতেন যে বিখ্যাত গায়কগণ তাঁহাকে সভায় বসাইয়া গীত ও বাদ্যের আলোচনা করিতে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিতেন। তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদে কত ইন্দ্রিয় পরবশকে জিতেন্দ্রিয়, কর্ম্মীকে কর্ম্মসিদ্ধ ও বিপদ গ্রস্তকে ভয়মুক্ত হইতে দেখিয়াছি। তিনি যাহা "হইবে" বলিতেন তাহা নিস্ফল হইতে কখন দেখি নাই।

এমন অনেক সময় হইয়া গিয়াছে, যে, কেহ মিথ্যাচরণ করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজজীর নিকট অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি সাত দিন তাহার মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। আবার কিছু বিলম্বে হয়ত তাঁহার রাগ পড়িয়া গিয়াছে ও তাহার প্রতি অহৈতুকী করুণায় পূর্ণ হইয়াছে ও তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া সস্নেহে নিজ পাত হইতে কিছু আহার্য্য তুলিয়া তাহার হস্তে দিয়া যাহাতে তাহার ঐ দোষ চলিয়া যায় তজ্জন্য তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ও কতই উপদেশ দিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়া-

ছিলেন, "মা, গেরস্থদের সঙ্গে আর অনবরত একঘেয়ে কথা কহিতে পারি না, মা একটি সন্ন্যাসী ছেলে দাও", এবং ঠাকুর ভাবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন শিশু স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে বলিতেছেন, "এই তোর সন্ন্যাসী ছেলে হবে," ঠাকুর বলিতেন, "রাখাল এরা ঈশ্বর কোটি। এরা সংসারের সাধারণ বদ্ধ জীবদের চেয়ে অনেক উঁচু থাকের।"

পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ অনেক সময় বলিতেন, "রাখালের আধ্যাত্মিক শক্তি আমার চেয়েও বেশী," যদিও শ্রীশ্রীমহারাজজী পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু ছিলেন তথাপি স্বামীজী তাঁহার পদধূলি লইতেন ও প্রণাম করিতেন। একদিন ঐ প্রকার করাতে—শ্রীশ্রীমহারাজজী, স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন "ছিঃ ভাই, তুমি অমন কর কেন?" উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "সে কিরে, তোর পায়ের ধূলা নেব না ত কার পায়ের ধূলা নে'ব। তোর যে পাহাড় পর্ব্বত সমান আধ্যাত্মিক শক্তি ভিতরে রহিয়াছে।"

শ্রীশ্রীমহারাজজী যেরূপ কঠোরতা ও ব্যাকুলতার সহিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ ও সাধনা করিতেন তাহা সাধক মাত্রেরই অনুকরণীয় ও শিক্ষার বিষয়। তিনি বরাহনগর মঠ হইতে বাহির হইয়া ৺কাশীধাম, নর্ম্মদা তীর, ওঁকারনাথ, গোদাবরী তীর, নাসিক, দ্বারকা, জুনাগড়, পুষ্কর, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন ও প্রত্যেক স্থানে কিছুকাল যাবৎ তপস্যা করেন। এই সময় তিনি জুতা, জামা, ছাতি কিছুই ব্যবহার করিতেন না। এমন কি একখানি কম্বল বা একটি জলপাত্রও তাঁহার সহিত ছিল না। দ্বিপ্রহরে গ্রামবাসীদের আহারাদির পর কোন ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। এই সময় তিনি পক্ক দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন।

চাউল, আটা প্রভৃতি কাঁচা দ্রব্য যাহা রন্ধন করিয়া আহার করিতে হয় তাহা গ্রহণ করিতেন না। রাত্রে বৃক্ষতলে, শ্মশানে বা নদীতটে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। কেহ অজাচিত ভাবে ট্রেণের টিকিট করিয়া না দিলে অধিকাংশ পথই নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেন। উত্তম আহার বা আদর যত্ন এরূপ অপছন্দ করিতেন যে কোথাও কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। শিব জ্ঞানে জীব সেবার ভাব সেই সময় তাঁহার ভিতর এরূপ প্রবল ছিল যে, রোগীর মুখ হইতে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া বমন লইয়া ফেলিয়া দিতেও তিনি কিয়ৎ পরিমাণেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

শ্রীশ্রীমহারাজজী অনন্ত ভাব, জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাকে যখনই আমরা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি; অনন্ত আকাশকে যখনই আমরা ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিতে যাই তখনই উহাকে আমরা ছোট করিয়া ফেলি কিন্তু যাঁহারা শ্রীশ্রীমহারাজজীকে আদৌ দেখেন নাই তাঁহাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে অল্প কিছু আভাষ দিবার জন্যই আমাদিগের এই প্রচেষ্টা।—শ্রীব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্য দে। সেবা ও সাধনা। ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

আমরা ছেলেবেলায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উদ্দেশ্য করে একটি গান লিখেছিলাম, তার প্রথম দুটী লাইন ছিল,—

"রাখাল বেশে আছ তুমি
বেশভূষাহীন।
তুমি নরেন্দ্র, তুমি মহেন্দ্র
শরৎ-শশী, যোগীন্!"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখ্‌বার ভাগ্য আমাদের ঘটেনি। কিন্তু রাখাল মহারাজে রাখালবেশী ঠাকুরকে দেখে আমরা প্রাণের তৃষ্ণা মিটাতাম।

আজ সেই রাখাল মহারাজ আমাদের ছেড়ে সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন!

মানুষ বড় কর্ত্তব্যের আহ্বানে ছোট কর্ত্তব্যকে ত্যাগ করে, তাই কি তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন!

স্বর্গ গঙ্গাকে মর্ত্তে নামাবার সময় মহাদেবকে সেই বেগ মাথায় করে নিতে হয়েছিল। কারণ সেই স্রোতকে কেন্দ্রীভূত না করতে পারলে জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো! তেমনি বিবেকানন্দ যে ভাবমন্দাকিনীর প্রবল ধারা বুদ্ধিরাজ্য হতে টেনে এনেছিলেন তার প্রথম বেগ সাম্লাতে হয়েছে ব্রহ্মানন্দকে। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর হতে আজ পর্য্যন্ত সেই ভাবময়ী স্রোতস্বিনীকে সংহত ও সংযত করতে পারতো ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর কে?—সেবা ও সাধনা। ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। [সাময়িক প্রসঙ্গ।]

পরমহংসাচার্য্য—ব্রহ্মানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র—রাখাল, স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ভাই—রাজা, শিষ্যের প্রিয়তম—মহারাজ, বিপুল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ইহধামে আর নাই। শ্রীভগবানের নবযুগ-লীলার পুষ্টির নিমিত্ত জগদ্ধিতায় যে চিন্ময়ধাম হইতে এই ত্রিতাপ-তাপিত ধরায় তাঁর আগমন হয়, গত ২৭শে চৈত্র, সোমবার মধ্যে ত্রয়োদশীর দিন এবং চতুর্দ্দশীর প্রারম্ভে রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি সেই নিত্যধামে পুনরায় প্রভুর পার্শ্বদত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত ১০ই চৈত্র শুক্রবার একাদশীর দিন, বাগবাজার পল্লীস্থ, বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হন। ঐ রোগ উপশমিত হইতে না হইতেই গত রামনবমীর দিন আবার তাঁহার জ্বর ও পূর্ব্বের বহুমূত্র রোগ অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র, শ্যামাদাস, চন্দ্রকালী, নীলরতন, কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই

ঐ দিন হইতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সন্দীহান হন। শনিবার মধ্যরাত্রে হঠাৎ তিনি তাঁহার সকল সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে নিকটে বসিতে বলেন এবং কি এক অদ্ভুত প্রেমাবশে মাতোয়ারা হইয়া জড়িত কণ্ঠে সকলকে অভয় ও ভরসার বাণী শুনাইতে থাকেন। তাহার পর স্বামী সারদানন্দজীকে ডাকিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে বলিয়াছিলেন, "আমার বিবেক, বিবেক, বিবেকানন্দ দাদা!" "বাবুরামকে চিনি, শ্রীরামকৃষ্ণচরণ জানি।" অতঃপর সারদানন্দ স্বামী উপস্থিত হইলে বলিলেন, "ভাই শরৎ, এসেছিস—আমার যে ব্রহ্ম-বেদান্ত গোল হয়ে গেল। তুই ত ব্রহ্মবিদ্যা জানিস্, কি বল দিকি।" শরৎ মহারাজ, "তোমার আবার গোল কি? ঠাকুর তোমার সব করে দিয়েছেন।" তখন বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রায় গিইছি, কেবল একটু পাচ্ছিনি। ব্রহ্ম-তিমির!" পরে বিদ্রূপের সহিত, "আচ্ছা, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম করচি, আবার লেমনেড লেমনেড করচিস্ কেন?" কথা শুনিয়া সকলেই মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। 'Father in Heaven', দেখ, দেখ, এও খুব সুন্দর, এও ভগবানের এক ভাব। চল্ চল্।" শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি লেমনেড খেয়ে ঘুমও।" তখন বলিলেন, "মন যে ঐ ব্রহ্মলোকে—নামতে চায় না—দে ব্রহ্মে ঢেলে।" কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "আহাহা! ব্রহ্ম-সমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! একটী বিশ্বাসের পত্রে ভেসে চলছি। আহাহা!" যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন যেন সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের শান্ত শীতল স্পর্শ, সমবেত সন্ন্যাসীমণ্ডলীর হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে আরও যে সকল গুহ্য কথা অপরের নিকট বলিয়াছিলেন, যাহা তিনি জানিতেন না, তাহাও তিনি তখন প্রকাশ করেন। "দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণ এসেছে। আমায় মল পরিয়ে দে, আমি তার হাত ধরে নাচব—ঝুম্ ঝুম্ ক'রে।

আমি যে ব্রজের রাখাল। * * * একটী ছোট ছেলে তার কচি হাত আমার পিঠে বুলুচ্চে, আর বলচে চলে আয়, চলে আয়। তোরা সর, আমি যাই। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" মহাপুরুষজীকে দেখিয়া বলেন, "শিবানন্দ দাদা এসেছ।" মহাপুরুষজী, "মহারাজ, তুমি চলে গেলে আমরা কি ক'রে থাকব। তুমি ইচ্ছে করলেই সেরে যাবে।" অভেদানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "কালী ভাই এসেছিস্, আমি যাচ্চি।" তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি থাক। তুমি ইচ্ছা কর, তা হলেই সেরে যাবে।" প্রভাতে শ্রীযুক্ত বিপিন ডাক্তার দেখিতে আসিলে বলিলেন, "বিপিন দাদা, ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা।" শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় দেখিতে আসিলে বলিলেন, "শিবই সত্য—ঔষধ মিথ্যা।" তাহার পর সকলকে বলিতে লাগিলেন, "রামকৃষ্ণঃ! রামকৃষ্ণঃ! রামকৃষ্ণঃ! ভয় কি তোদের, তোরা ভগবানের নাম কর। তোরা সব তাঁর।" তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের নিকট রাখিয়াগিয়াছেন, কেবল তাঁহার তপোপূত পবিত্র, মধুর, প্রেমময় জীবন। আকাশের চাঁদ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিক্ মিক্ করে। মাছেরা তাহার সহিত খেলা করে, ভাবে এ বুঝি আমাদেরই একজন। তারা কি তখন বুঝিতে পারে এ চাঁদ চলিয়া যাইবে। এ চাঁদ আকাশের! জলের নয়!—স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। [ইনি বর্ত্তমান "উদ্বোধন"—মাসিক পত্রের সহযোগী সম্পাদক।] ২৪শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২৯ সাল "উদ্বোধন"।

সম্মুখে মৃত্যুর ভৈরবী ছবি, পশ্চাতে স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া। একটী একটী করিয়া জীবন পথের আলোক নিবিতেছে, আর আমি স্থির শুষ্ক চক্ষে চাহিয়া আছি! এই চোখেই দেখিয়াছি, আকাশের উর্দ্ধতম বিন্দু হইতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অন্তর্ধান—শ্রীরামকৃষ্ণের লোকলীলা অবসান।

তারপর শ্রীযোগানন্দ, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ, শ্রীত্রিগুণাতীত, শ্রীপ্রেমানন্দ, শ্রীঅদ্ভুতানন্দ, পরমারাধ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা—একে একে সকলের জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশেষে শ্রীব্রহ্মানন্দে বিকশিত ব্রহ্মজ্যোতি পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া গেল। মনে হইল যেন আপনার হইতে আপনার কাহাকে হারাইলাম, কিন্তু চক্ষু ভিজিল না; বুঝি, শোকের শেষ সম্বল অশ্রুজল নিঃশেষ হইয়া গেছে; আছে কেবল এই জীবন-সায়াহ্নে অর্দ্ধ জীবন-ব্যাপী স্মৃতির সুদীর্ঘ ছায়াপাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'রাখাল আমার ছেলে'—মানসপুত্র। ইহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ আমার নাই। তবে শিখা হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্চার, যদি একথার তাৎপর্য্য হয়, পিতা-পুত্র উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিলেন—রাখাল আমার ছেলে।

যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'স্বামিজী' বলিলে যেমন শ্রীবিবেকানন্দকে, 'মহারাজ' বলিলে তেমনি শ্রীব্রহ্মানন্দকে বুঝাইত) অমিত ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জ্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায়, কি অমোঘ শক্তি তাহার অন্তর্নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয় চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন! সাধু ভক্ত, ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চিত্ত

লইয়া, অথবা, ব্যথিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া, যে কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এ সত্য অনুভব করিয়াছেন। তিনিই দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয়, সেই অনাদৃত-জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন! আত্মীয় স্বজন যাহার নাম মুখে আনিতে কুণ্ঠা বোধ করে, কি স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তার তত্ত্ব লইয়াছেন! যে অভাগা সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন! যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তার জন্য চির-উন্মুক্ত! এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত, শান্ত, শিবময় পুরুষের অন্তরে কি মহান্ ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মানুরক্তি, সংসার-মোহ-হারিণী কি মহাশক্তি উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞান-চর্চ্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্ম্মী কর্ম্মকৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসার ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রস-স্ফূর্ত্তিতে মহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশচিত্ত উৎসাহে, ভগ্নহৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত; অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে বালক হইয়া খেলা করিতেন!

মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, সেথায় দুঃখ দৈন্য শোকের প্রবেশাধিকার ছিল না; রিপুর দল বল প্রকাশ করিতে পারিত না; সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—অমায়িক মহারাজের ব্যবহারে তাঁহারা

ভাবিতেন,আমিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত, সংসারের বহু উর্দ্ধে কোন্ এক অত্যাশ্চর্য্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি—যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দহীন, আনন্দ অবাধ। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিকতায় (Spirituality) রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়, তাহার মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ধন্য! হায়, এই আধ্যাত্মিকতায় মানব দেবতা হয়, কিন্তু চিরজীবী হয় না! শরীর ধ্বংস হইলেও তাহার স্মৃতি অবিনাশী। দুর্ল্লভ রত্ন যখন সুদুর্ল্লভ হয়, তখন নিভৃত পূজা লইবার জন্য তাহার স্মৃতি আমাদের বুক জুড়িয়া বসে।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। উদ্বোধন। ২৪ বর্ষ—৫ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

একদিন আমি ও ডাক্তার কাঞ্জিলাল সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি। ঐ রাত্রে মঠে ছিলাম। আরও ৪।৫টী ভক্ত মঠে উপস্থিত ছিল। রাখাল মহারাজ আমাকে "চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ডাকিতেন। ঐ রাত্রে আমরা মঠের পশ্চিম বারান্দায় বসিয়া আছি। রাখাল মহারাজ পশ্চিমাংশে —বেঞ্চের উপর বসিয়াছেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন "চক্রবর্ত্তী! তুমি ঠাকুর ও স্বামীজির কত স্তব গান বাঁধিয়াছ। কৈ আমার কোন গান বাঁধ নাই?" আমি বলিলাম, আপনার নামেরও একটী গান তৈয়িরি করেছি—তবে সব কলি এখন মনে নাই। তিনি বলিলেন—"যা মনে আছে তাই গেয়ে ফেলো।" আমি গাইলাম :—

কে তুমি রাখাল রাজা সাজিয়ে নরের সাজে
গোলোক আসন ছাড়ি এসেছ গুরুর কাজে॥
সরল বালক মতি—মায়ামুক্ত মহাযতি,
বাল গোপাল মুরতি—অন্তরে সদা বিরাজে॥

গানের এইটুকু মাত্র মনে ছিল। মহারাজ শুনিয়া বালকের মত "বেশ্" "বেশ্" বলিলেন। আরও বলিলেন, "হবে না? ও কেমন গুরুর চেলা!!" উপস্থিত ভক্তেরা তাঁহার কথায় খুব হাসিতে লাগিলেন। ঐ গানের অন্য কলি দুটী পাঠকবর্গকে অবগত করান যাইতেছে।

বাহিরে বালক হাস, ভিতরে ব্রহ্মবিকাশ
কে চিনিতে পারে তোমা—চেনা নাহি দিলে নিজে॥
তব পদে করি নতি, মাগিহে গুরু ভকতি,
গুরুদত্ত মন্ত্র যেন নিয়ত হৃদয়ে বাজে॥

—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।

"স্বামী-শিষ্য-সংবাদ", "সাধু নাগমহাশয়" প্রভৃতির গ্রন্থকার।

উদ্বোধন। ২৪বর্ষ—১২ শ সংখ্যা। পৌষ, ১৩২৯।

গান।

[ইমন কল্যাণ—চৌতাল।]

নমো নমো নমো শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বপাতক নাশন।
সারদেশ্বরী পরমেশ্বরী ব্রহ্মশক্তি তুহুঁ চরণে প্রণাম।
নমো ব্রহ্মশক্তি—মানস-পুত্র লোকোত্তর উদার চরিত্র
নমো ব্রহ্মানন্দ অতি পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মানস-রঞ্জন।
বিষয়ানন্দ জানি অসার "ব্রহ্ম-বেদান্ত" করিলে সার।
ব্রহ্মানন্দ করিতে প্রচার ব্রহ্মানন্দময় দেহধারণ।
লহ প্রণাম লহ প্রণাম ভক্তবৎসল করুণাধাম
রামকৃষ্ণপদে রহে যেন মন এই আশীর্ব্বাদ কর প্রদান।

গান।

[কেদারা—চৌতাল।]

ভজ রে মন ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ-মানস-রঞ্জন।
ব্রহ্মবিৎ-অগ্রগণ্য ব্রহ্মানন্দে সদা মগন॥
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-দীপ্ত নয়ন ঝরিছে ব্রহ্মজ্যোতির কিরণ
আলোকরাশি আঁধারনাশি করিছ হৃদয়ে পুলক প্রদান।
ব্রহ্মানন্দ শ্রীবিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ভুজদ্বন্দ্ব
বরাভয়ময় ভুজদ্বন্দ্ব করে বরাভয় বিশ্বে প্রদান।
অদ্ভুতানন্দ রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব
ভজ যোগানন্দ প্রেমানন্দ ত্রিগুণাতীতাদি নিরঞ্জন।
সনাতনধর্ম্ম-রক্ষাকারণ রামকৃষ্ণসনে ধরাবতীর্ণ
স্বগণ-সহিত-পরব্রহ্ম করিলেন শরীর ধারণ।
ব্রহ্মানন্দ গণাধিপতি রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ-ভূপতি
পরম দয়ালু ভকত প্রতি কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন॥

পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি কর্ত্তৃক বিরচিত।

উদ্বোধন ২৪ বর্ষ—৫ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

গত সোমবারে রামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত—বিবেকানন্দের কীর্ত্তি বেলুড়-মঠের নিম্নে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর কূলে স্বামী ব্রহ্মানন্দের [বঙ্গবিশ্রুত-কীর্ত্তি রাখাল মহারাজের] নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। যিনি রাম-কৃষ্ণের উপদেশ ও আদর্শ আপনার জীবনে গ্রহণ করিয়া—সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসাৎ করিয়া এই জড়বাদপ্লাবিত দেশে অধ্যাত্মবাদের পুণ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—যিনি সংশয়ের আবর্ত্তের মধ্যে ভক্তির দৃঢ় শৈলের মত দণ্ডায়মান ছিলেন—যিনি জরামৃত্যুব্যাধিপ্রপীড়িত

পৃথিবীতে জীবকে মুক্তির সন্ধান দিতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়া আপনার সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। ইহাতে দুঃখ নাই। মায়াবদ্ধ জীব আমরা—আমরা শোকে কাতর হই ; কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে লোক যে মহাসমাধি লাভ করেন—তাহা অনিবার্য্য। ধীর তাহাতে কাতর হয়েন না।

রামকৃষ্ণের সাধনা—ব্রাহ্মণের সাধনা। সেই সাধনা বিবেকানন্দের আধারে রক্ষিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ বেদান্তের শিক্ষা দিয়া সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি এ দেশের আচার ব্যবহারে কালোচিত পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণের পুণ্য নামে দেশে সর্ব্বত্র সেবাধর্ম্মের আদর করিতে শিখাইয়াছিলেন। সে কার্য্যে কায়স্থ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাহায্য কিরূপ তাহা অনেকে অবগত নহেন। বিবেকানন্দের প্রতিভায় যে প্রাবল্য ছিল তাহা গঠন কার্য্যের পক্ষে কতটা উপযোগী ছিল, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন—তিনি কল্পনা প্রবণ ছিলেন—সাফল্যের সুমেরুশিরে মুক্তির আলোক দীপ্তি দেখিতেন—দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। নীরব কর্ম্মী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই রামকৃষ্ণ মিশনের শত শত সঙ্ঘের চালক হইয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার তিরোভাবে আমরা এক একবার শঙ্কানুভব করিতেছি—যদি তাঁহার প্রভাবের অভাবে সে সব কার্য্য কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয়—এই সব অনুষ্ঠানের কোন ক্ষতি হয়।

জানি—ব্রহ্মানন্দের কার্য্যের যে মূল তাহা বিনষ্ট হইবার নহে—যে উৎস তাহা শুষ্ক হইবার নহে। তাই শঙ্কার মধ্যে আমরা এই বিশ্বাসে সান্ত্বনা লাভ করিতেছি—জগতের কল্যাণকর কার্য্যের ধারা লুপ্ত হইবে না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোভাবে বঙ্গদেশে ইন্দ্রপাৎ হইয়া গেল।—

বাঙ্গালীর মনীষা এই জড়বাদের যুগে কেমনভাবে তাহার চিরাচরিত উন্নতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আবশ্যক পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাই রামকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত পথে বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে ও জ্ঞানকে পরিচালিত করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব। বাঙ্গালার ধর্ম্মগগনে যখন ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত, তখন সেই অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রামকৃষ্ণচন্দ্রোদয়—তাই সমগ্র বঙ্গদেশ ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই শশধরের পার্শ্বে যুগল তারকার উদয়—বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ; সঙ্গে সঙ্গে আর যে সব জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল—অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহারাও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর বিবেকানন্দের ও ব্রহ্মানন্দের জ্যোতিঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিবেকানন্দ কয় বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যোতিঃ সংহরণ করিয়া অস্তাচলাবলম্বী হইয়াছেন। আজ ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরু নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেই আলোকসাগরে বিলীন হইলেন। সন্ন্যাসী তিনি তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিবার অধিকার কাহারও নাই। সন্ন্যাসীর সাধনা আজ শেষ হইল। তিনি মহাসমাধি লাভ করিলেন। আজ দেশ তাঁহার অভাবে দরিদ্র হইল। কিন্তু তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেহ রক্ষা করিলেন, সে আদর্শ যদি তাঁহার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অনুসৃত হয়—তবে বাঙ্গালীর সাধনা আবার সিদ্ধিলাভ করিবে এবং বাঙ্গালীর গৌরবে কেবল বাঙ্গালা নহে,—কেবল ভারতবর্ষ নহে—সমগ্র জগৎ গৌরবান্বিত হইবে। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন—তাহাই হউক।—দৈনিক বসুমতী, ৮ম বর্ষ২৯শে চৈত্র, বুধবার ১৩২৮ সাল। ইংরাজী ১২ই এপ্রেল ১৯২২

শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র, লোক-কল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন! লোক বিশ্রুত শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী, কাঙ্গালের রাখাল মহারাজ আর নাই! দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসিদিগকে এই দুঃসম্বাদ দান আমাদের অদৃষ্টে ছিল। সে জীবন্ত বিগ্রহ স্বরূপ শান্তির প্রশান্ত মূর্ত্তি লোকচক্ষু হইতে চিরান্তরিত হইয়া ভক্তের হৃদয়াসনে চির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে!

কিছুদিন হইতে স্বামীজি বাগবাজার বসুপাড়াস্থ ভক্তপ্রবর ৺বলরাম বসুর বাটীতে বাস করিতেছিলেন। গত ১০ই চৈত্র শুক্রবার (২৪শে মার্চ্চ) সকালে তিনি সুস্থাবস্থায় ভ্রমণে বাহির হন। কিন্তু কিছুদূর গমন করিবার পরই শৌচের চেষ্টায় পুনরায় তাঁহাকে বসুভবনে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহার পর হইতেই বিসূচিকার সূত্রপাত হয়। চিকিৎসকগণ প্রথমে হতাশ হন নাই। কিন্তু কোন ভক্ত শুনিয়াছিলেন, স্বামীজী জনৈক সন্ন্যাসী সেবককে বলিতেছেন, "ডাক্তার যাই বলুক, এ রোগকে বিশ্বাস নাই ; শিব নাম কর, শিব নাম কর।"

চিকিৎসকগণ প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বিসূচিকা সারিল। কিন্তু সহসা কালস্বরূপ বহুমূত্র রোগের পুনরাবির্ভাব হইল। তাহার পর অক্ষুণ্ণ যত্ন, অশ্রান্ত সেবা, অক্লান্ত শুশ্রূষা সাধু-সন্ন্যাসী গৃহস্থ সকলের আশা-ভরসা নির্ম্মূল করিয়া গত ২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রেল) সোমবার রাত্রি ৮॥ ও ৯টার মধ্যে স্বামীজী লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

দেহ-রক্ষার ঠিক চারিদিন পূর্ব্বে স্বামীজী জনৈক সন্ন্যাসী সেবককে বলেন, "কলকেতার বদ্ধ বাতাস ভাল লাগছে না। ভুবনেশ্বরে চল, সেখানে মুক্ত বাতাস—"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "আপনি এখনও বড় দুর্ব্বল—"

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলেন, আর তিন চারদিন পরে বেশ যেতে পারব।”

ঐ দিন কোন চিকিৎসককে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “ব্রহ্মই পরাবি, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা।”

ভুবনেশ্বর মঠই স্বামীজীর শেষ কীর্ত্তি। ইহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই মঠকে ভারতের আদর্শ মঠরূপে গঠন করিবেন।

সর্ব্বলোক প্রিয় মহারাজ সম্বন্ধে আজ কত প্রসঙ্গ কত তরঙ্গই না আমাদের মনে উঠিতেছে, হৃদয়মূলে আছড়াইয়া পড়িতেছে, তার একটা কথাও আজ আমরা গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না। সদ্যঃশোক কথা কহিবার অবসর দেয় না। সে জানে কেবল হাহাকার করিতে।

একটা প্রথা আছে, মৃতের আত্মীয় স্বজনকে শোকে সান্ত্বনা দিতে হয়। যাহার বসুধেব কুটুম্বকম্ তাহার শোকে কাহাকে সান্ত্বনা দিব? স্বামীজীর সন্ন্যাসী ভ্রাতাদিগকে আমরাইত তাঁহাদের কাছে সান্ত্বনার প্রার্থী। তবে কাহাকে সান্ত্বনা দিব? সে দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীর শোক যে করুণ ক্রন্দন রোল তুলিয়াছিল, এখনও তাহা শান্ত হয় নাই, তার উপর আবার এই বজ্রাঘাতে ভক্তগণ মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন?—দৈনিক বসুমতী। ৮ম বর্ষ। ২৯শে চৈত্র বুধবার ১৩২৮। ২০০ সংখ্যা। কলিকাতা সংস্করণ। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত।

আমাদের রাখাল মহারাজা—বাল্যের, শৈশবের, যৌবনের, প্রৌঢ়ের এবং অনেকাংশে বার্দ্ধক্যের আদর্শ উপদেষ্টা নায়ক—আমাদের রাখাল মহা ড শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ গত কল্য কন্দর্প চতুর্দ্দশীর দিনে বেলুড়ে গঙ্গাতটে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর লোকান্তর গমন—সিদ্ধ সন্ন্যাসীর তিরোভাব, শোক ত করিতে পারি না। কিন্তু যাহা

গেল যেমনটি গেল তেমনটি ত আর পাইব না! অমন কঠোর সন্ন্যাস ও ত্যাগ, অমন আত্মগোপন করিয়া অন্যের দ্বারা কর্ম্মসাধনা আর ত কাহাকেও করিতে দেখিতে পাইব না। রাখাল মহারাজ কে ছিলেন কেমন ছিলেন তাহা বাহিরের লোকে জানে কি? স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ভবের সময় হইতে যিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া চুপে চুপে কাজ করিতেছিলেন, যাহার কর্ম্ম প্রভাবে দিনে দিনে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ জগৎ জুড়িয়া কর্ম্মসাফল্য ফুটাইতেছিলেন, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন তাহা সাধারণ বাঙ্গালী এখন ঠিকমত জানে না। বিরাট কর্ম্মীপুরুষ, সাগর-সমান বিশাল হৃদয় লইয়া, অগাধ-অপরিমেয় ভাবরাশি লইয়া নীরবে কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার গণা দিন শেষ হইল, শ্রীগুরুর আহ্বান আসিল তিনি চলিয়া গেলেন। এখন কাঁদ মা জাহ্নবী বেলুড় মঠের তটদেশে তোমার তরল, শীতল, নির্ম্মল স্নেহবারীর ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া কাঁদ মা জাহ্নবী,—কুল কুল রবে, উদাস সঙ্গীতের কল্ কল্ ছল-ছল রবে কাঁদ মা ভারত পাপ সংহন্ত্রী জাহ্নবী কাঁদ মা! আমরা অধম, অপূর্ব্ব নিধি পাইয়া তাহার পরিচয় লইতে পারি নাই, দেবতাকে ক্রোড়ের কাছে পাইয়া তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে পারি নাই। আজ সে নিধিকে তোমার তরল তরঙ্গে হারাইয়া আমরা নির্নিমেষ নয়নে কেবল তোমার চঞ্চল গতাগতি লক্ষ্য করিতে থাকি! কাঁদ ভাই বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—তোমাদের রাখাল রাজা আজ মথুরায় চলিয়া গেল,—বাঙ্গালার ব্রজবিলাস ছাড়িয়া মহাযাত্রা করিল। তোমাদের মাথা গেল, হৃদয় গেল, বন্ধনী গেল, এখন এই নি রাখালের দলকে শ্রীভগবানই রক্ষা করুন—তাঁহার কর্ম্ম তিনি করুন।—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ সম্পাদক

দৈনিক নায়ক। ২৮শে চৈত্র, মঙ্গলবার সন ১৩২৮ সাল। ১১ই এপ্রেল ১৯২২। ১৫শ বর্ষ।

বেলুড়-মঠের গৌরব-চূড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনের আদর্শদেবতা মহারাজা—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র রাখাল—মায়াত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী হইয়াও যিনি স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার আধারস্বরূপ ও সর্ব্বজীবে করুণাময় ছিলেন, তিনি অসংখ্য ভক্তের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া ২৭শে চৈত্র সোমবার রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক স্নেহ, অপরিমেয় ভালবাসা, অসীম করুণালাভে সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন; যাঁহারা সেই পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময় সদাহাস্তরঞ্জিত মূর্ত্তি যুগযুগান্তরের তপস্থার ফলে দর্শন করিয়া তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছেন, মর-জগতের ভাষায় তাঁহাদের হৃদয়ে এ বিয়োগ ব্যথার শান্তি নাই। প্রিয়তম প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনাও এত কঠোর—এত মর্ম্মস্পর্শী নহে। ভক্ত-হৃদয়ের এ ব্যথা কেবল তিনিই প্রশমিত করিতে পারেন।

জানি, তিনি অবিনশ্বর—স্বয়ং ব্রহ্ম তিনি অব্যয়—তিনি ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তাঁহার বিনাশ নাই—তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, কিন্তু শোক-মুহ্যমান হৃদয় সে যুক্তি তর্কে সান্ত্বনা মানিতে চাহে না।, সে যে দর্শন আশায় ব্যাকুল!

রাখাল মহারাজ ধনীর সন্তান, ধনীর গৃহে বাল্যে বিবাহিত, মানুষ যাহাতে সুখী হয়, সংসারে বাল্যে তাহার কিছুর—বিলাসের কোন উপাদানের তাঁহার অভাব ছিল না; কিন্তু সে সকল অকিঞ্চিৎকর ভোগসুখ ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিহার করিয়া তিনি সুকঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন করিয়াই তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পরমহংসদেবের কোলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। উভয়ে উভয়ের দর্শনাশায় বহুদিন হইতেই যেন উৎকণ্ঠিত ছিলেন! যেন বহুদিনের বাঞ্ছিত হারান ধন—অমূল্যনিধি মিলিয়া গেল। সে মিলনে কত আনন্দের—কত স্নেহের অনাবিল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-পাঠকের অবিদিত নাই। যে একাদশ জন প্রথম পরমহংসদেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। পরমহংসদেব মহারাজকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন—তাঁহার আদরের নাম ছিল রাজা—রাখাল রাজা। স্বামী বিবেকানন্দও মহারাজকে রাজা বলিয়া ডাকিতেন। রাখাল, শশি ও লাটু মহারাজ-ত্রয় (ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ) পরমহংসদেবের যত সঙ্গ ও যত সেবা করিয়াছেন, তত সঙ্গলাভ বুঝি আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

পরমহংসদেবের মানব শরীর ত্যাগের পর রাখাল মহারাজ সুকঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার সাধনার ইতিহাস তিনি সংগোপনে রাখিতেন—অহমিকা-প্রকাশের আশঙ্কায় তাহা কোন দিন প্রকাশ পাইতে দেন নাই। হিমালয়ের নিভৃত গুহায় তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন; বৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া দিনান্তে একখানি মাত্র রুটী খাইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুকঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহাজ্ঞান লাভজনিত কোনরূপ অভিমান—কোনরূপ গর্ব্ব তাঁহার ছিল না। শত-প্রযত্নে তিনি সে দিব্যজ্ঞান সংগোপন করিতেন, সদা হাস্য-পরিহাস রসিকতার সম্মোহন-প্রভাব দিয়া আত্মগোপন করিতেন। সংসার

মোহাচ্ছন্ন কৌতূহলী মানব তাঁহার লোকাতীত জ্ঞান—অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইত না—কিন্তু পাইত এক অপূর্ব্ব শান্তি। ত্রিতাপদগ্ধ মানব যখনই সংসার-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সেই সুধাকরের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তখনই তাহার অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ের শোক-তাপ-জাড্য-অবসাদ বিদূরিত হইয়া তথায় এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—মরজগতে ভালবাসার অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছে। শান্তির পুলক-ধারায় তাহার মনে এক অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ বহিয়াছে।

আমেরিকাগমনের পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজকে বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মঠের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তাঁহার নেতৃত্বে—তাঁহার প্রাণপাত সাধনায়—অনুপ্রেরণায় আজ ভারতের প্রতি জনপদে অসংখ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ সংগঠিত হইয়াছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড়-মঠে অসংখ্য মুক্তিকামী যুবককে প্রতি বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষা দিতেন। ৪।৫ বৎসর তাঁহাদিগকে কঠোর সংযমে নানা সাধনায় অভ্যস্ত করাইয়া প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে এবং তিথি পূজার দিনে গুরু ব্রহ্মানন্দ অসংখ্য ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। তাঁহারাই তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে দিকে দিকে ভারতে—য়ুরোপে—আমেরিকায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া অসংখ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, মিশন, সেবাশ্রম, সোসাইটী, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-শান্তিকেন্দ্র প্রভৃতি মানবমঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল কল্যাণ-উৎস হইতে মুক্তিকামী মানব শান্তি ও মুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তিলাভে ধন্য হইতেছে। এই সকল সঙ্ঘের গুরু—নেতা—চালক মঙ্গলকল্পতরু ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার অনুপ্রেরণা—সমন্বয়-নৈপুণ্য—সংগঠন-শক্তি পৃথিবীতে অতুলনীয়। বৌদ্ধযুগের পর ভারতে কোন ধর্ম্ম-মতের এমন কল্পনাতীত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু এত বড় বিরাট মানবমঙ্গলকর কর্ম্মের নেতৃত্ব করিয়াও স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিনও তপস্যায় ক্ষান্ত হয়েন নাই। সাধনায় শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগে জীর্ণ হইয়াছেন—সাধনার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, কিন্তু তপস্যার বিরাম নাই।

পুরীতে স্বাস্থ্যলাভের আশায় গিয়াছেন—শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু শশি-নিকেতনে তাঁহাকে সারারাত্রি বিনিদ্র হইয়া কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছি। কাশীতে সেবাশ্রমে অসুস্থ শরীরে সারারাত্রি ধ্যান করিতেন। পুরীতে দেখিয়াছি, হাস্যপরিহাসে রসরঙ্গের স্রোতের উজান বহিতেছে; কথায়, বিদ্রূপে, কৌতুকে হাসিয়া হাসিয়া আমরা অস্থির হইতেছি, তখনও মহারাজ বারান্দায় কপালে একটি আঙ্গুল ঠেকাইয়া দেবদুর্লভ ঈষৎ বঙ্কিমঠামে নাচিতেছেন—অনুপমকণ্ঠে গাহিতেছেন—

"যাইতে সাগরে, আশা নগরে,
আশীষ তোমারে করি হে রায়।"

আবার কিছু পরে কি গম্ভীর—সমাধিমগ্ন। সে গম্ভীরতার কল্পনা হয় না—ভাষায় তাহা পরিস্ফুট হয় না।

পুরীর শশি-নিকেতনে তিনি দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। পুরীর জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না; কিন্তু বুঝি, উড়িষ্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের অমোঘ প্রভাবের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার বাসনায় তিনি এত দীর্ঘকাল পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। হিন্দুর স্থাপত্যবিদ্যার পূর্ণপরিণতির ধ্বংসাবশেষস্থল, পুণ্যভূমি ভুবনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ সগৌরবে হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী-স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার শেষ কীর্ত্তি—শেষ নিদর্শন। এ কীর্ত্তির সম্যক্ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধারণকে কেবল ধরা না দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। যিনি যে ভাবের ভাবুক—যে রসের সাধক, সেই ভাবেই—সেই রসেই তাঁহাকে সম্মোহিত—বিস্মৃত করিতেন। বিলাসী বাবুরা তাঁহার রঙ্গরসে অবাক হইত—সাহিত্যিক সাহিত্যরসে আপ্লুত হইত—রাজনীতিক রাজনীতি-সমস্যায় মীমাংসা পাইত—সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত বিদ্যার মূর্ত্ত বিকাশ দেখিত—হাকিম ব্যবহারাজীবরা আইনের খেলা দেখিত—জীবন-সমস্যায় বিপন্ন ব্যক্তি অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইত—সংসার-সুখ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির আহার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা হইত। আর ভক্তগণ দেখিতেন, জগতে অতুল—সেই রাতুল চরণ—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রফুল্ল-কমল-প্রস্ফুরিত আনন্দহিল্লোলিত প্রশান্ত হৃদয়। এ জগতে কি তাহার তুলনা আছে—উপমা আছে? দর্শনে কত আনন্দ—সংসার-বিভ্রম—আত্ম-বিস্মৃতি। স্পর্শের কি সম্মোহিনী শক্তি—যেন একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শ—কি পুলক-হিল্লোল—আনন্দের অনুভূতি সর্ব্বদেহে নৃত্য করিত আর বাক্য-স্ফুরণ শক্তিহীন জড়িত রসনা অজ্ঞাতে সেই মধুময় নামজপে ব্যস্ত হইত।

শরীর ত্যাগের পূর্ব্ব রাত্রিতে অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া সমবেত সন্ন্যাসী ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "আহা-হা! ব্রহ্মসমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! একটি বিশ্বাসের পত্রে ভেসে চলেছি!"

বাঙ্গালীর বহুপুণ্যে ভারতে এমন নীরবকর্ম্মী মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি লীলা-অন্তে স্বধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সেই শিশুর সারল্যমণ্ডিত সদাহাস্যরঞ্জিত, জ্ঞান ও প্রতিভা-গঠিত দিব্যমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অনুপ্রেরণায়—আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালীর মন্ত্রসাধন সফল হইবে।

মাসিক বসুমতী। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৯।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মরণার্থে।

নয়ন রঞ্জন সুত, পত্নী প্রিয়তমা
নবীন যৌবনে ত্যজি' অসীম মহিমা
দেখালে জগতে, ওহে তাপস ধীমান !
দ্বিতীয় সিদ্ধার্থ যেন হয়ে মূর্ত্তিমান !
সিদ্ধ মহাপুরুষের দিব্য যোগ্ বলে
মানস পুত্রের রূপে তাঁর পদতলে
হ'লে আসি' উপনীত, করিলে গ্রহণ
"জীবে সেবা" ব্রত, পণ, ' মন্ত্রের সাধন
কিম্বা শরীর পতন"। হে তাপসবর !
ভারতের সর্ব্বস্থানে লোক হিতকর
আশ্রম নির্ম্মাণ করি', করিলে আপন
সুমহান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ সুদৃঢ় স্থাপন,
সমগ্র হিন্দুর মুখ করিলে উজ্জ্বল
একক সন্ন্যাসী, হয়ে কৌপীন সম্বল !
কঠোর সাধনা করি' হিমাদ্রি কোটরে
লভিলে "সচ্চিদানন্দ"—দুর্লভ সংসারে ;
ব্রহ্মের আনন্দ পেয়ে ভবের "রাখাল"
ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত রবে চিরকাল !
বিবেকানন্দের পদ-অঙ্ক অনুসরি',
বিবেকের জয়ধ্বজা যুগান্তর করি
উড়ালে গৌরবে যথা, সবে সেই মত
তোমার পদাঙ্ক দ্বারা হউক চালিত।

বরাহনগর, ১৩।১১।২৯। শ্রীব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ।